নূতন কলমে

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিভাগীয় গবেষণামূলক সাময়িক ই-পত্রিকা

প্রথম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা

আগস্ট ২০২৪

নূতন কলমে

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের একটি বাংলা বিভাগীয় গবেষণামূলক সাময়িক ই-পত্রিকা

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
আগস্ট ২০২৪

প্রকাশনায়:

সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক মণ্ডলী

(যৌথ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সমিতি'র তরফে)

বাংলা বিভাগ
দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

https://dinhatacollege.ac.in/নূতন-কলমে/

NUTAN KALAME a departmental research periodical e-journal of Department of Bengali, Dinhata College; Published by “Sahitya O Gabeshana Bishayak Mandali” on behalf of the “Joutha Sahitya-Sangskriti Bishayak Samiti”.

First year, Second issue

Exchange price: Free

© Department of Bengali, Dinhata College

সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক মণ্ডলী

প্রকাশক:
শুভ্রা কর্মকার

অতিরিক্ত প্রকাশক (কোষাগার):
শ্রাবণী রায়

যুগ্ম সম্পাদক:
ধৃতিমান চৌধুরী
শ্রীময়ী সাহা

সহযোগী সম্পাদক:
সুস্মিতা রায়
প্রীতম দে
মৌসুমী পারভীন

প্রকাশ তিথি : ৩১শে আগস্ট ২০২৪,শনিবার

উপদেষ্টা মণ্ডলী:
ড. অমিতাভ দত্ত
ড. শুচিস্মিতা দেবনাথ
ড. সুভাষ চন্দ্র দাস
ড. জয় দাস
শ্রী শুভদ্বীপ সরকার
শ্রীমতি অন্বেষা বর্মণ

অনুমোদক : ড. আব্দুল আওয়াল
অধ্যক্ষ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

পৃষ্ঠপোষক: বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

প্রচ্ছদ:
ধৃতিমান চৌধুরী
অলংকরণে:
ধৃতিমান চৌধুরী
পাণ্ডুলিপি সংশোধন:
বন্দনা বর্মণ ও সম্পা মোদক

ই-মেইল:
publisher.nutankalame@outlook.com

ওয়েবসাইট:
https://dinhatacollege.ac.in/নূতন-কলমে/

বিশেষ সহযোগীতায়

সভাপতি ও পারিষদ : সাধারণ সমিতি

সভাপতি:
রিক সাহা
সহযোগী সভাপতি:
রমজান আলী
রাহুল দাস

মুখ্য আহ্বায়ক মণ্ডলী
মুখ্য আহ্বায়ক:
লিমন হক
সহযোগী মুখ্য আহ্বায়ক:
জিসান আহমেদ
সম্পা মোদক
আহ্বায়ক (কোষাগার):
বন্দনা বর্মণ
আহ্বায়ক (প্রচার ও কার্যালয়):
কুণাল কুন্ডু
আহ্বায়ক (অনুষ্ঠান):
সম্রাট সরকার
আব্দুর ফারুক
আহ্বায়ক (সমন্বয়কারী):
বিশ্বদীপ সাহা
সীমা সন্ন্যাসী
শ্রেয়া চক্রবর্তী

বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দের শুভেচ্ছা পত্র

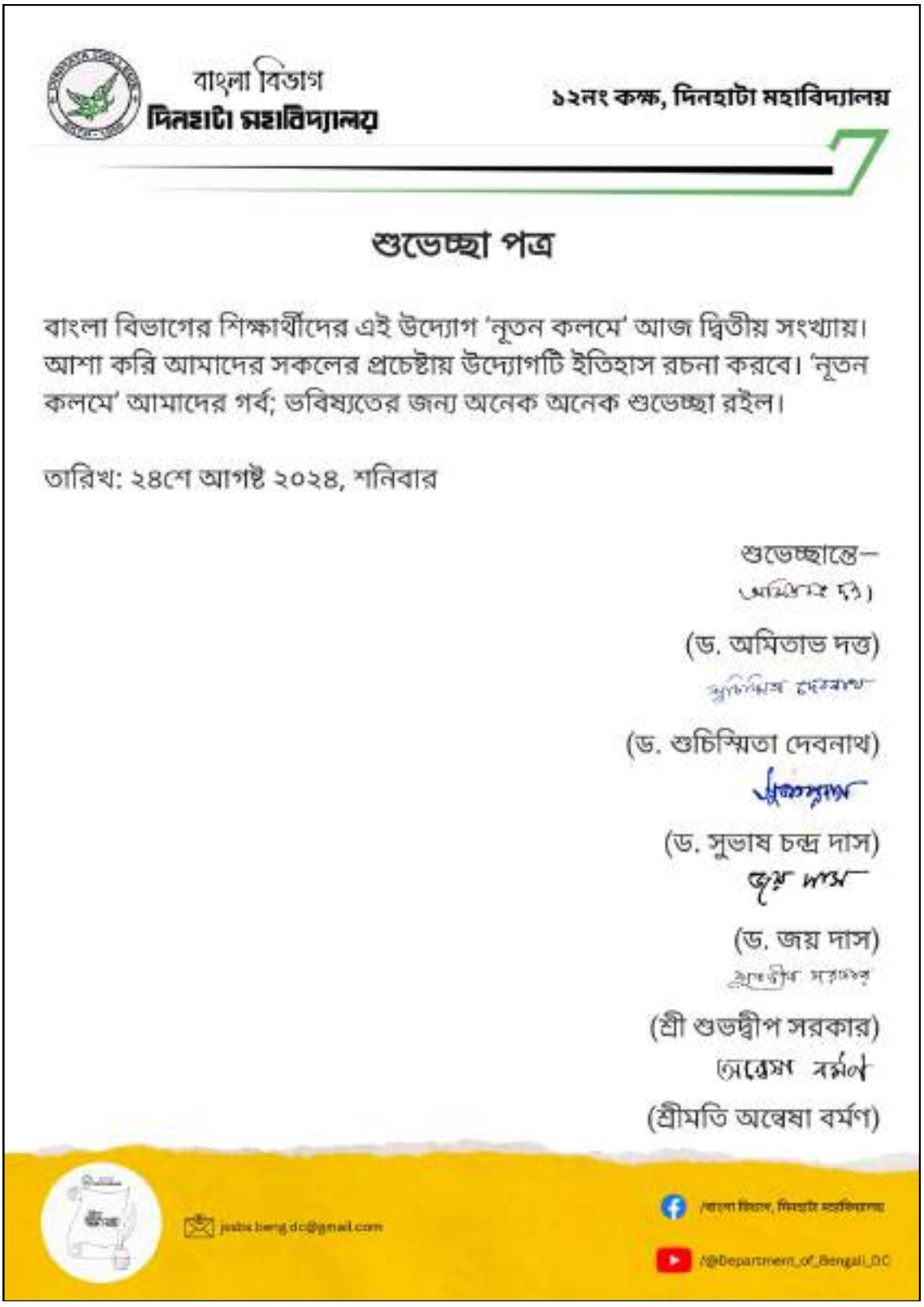

বাংলা বিভাগ
দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

১২নং কক্ষ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

শুভেচ্ছা পত্র

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগ 'নূতন কলমে' আজ দ্বিতীয় সংখ্যায়। আশা করি আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় উদ্যোগটি ইতিহাস রচনা করবে। 'নূতন কলমে' আমাদের গর্ব; ভবিষ্যতের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল।

তারিখ: ২৪শে আগষ্ট ২০২৪, শনিবার

শুভেচ্ছান্তে—

(ড. অমিতাভ দত্ত)

(ড. শুচিস্মিতা দেবনাথ)

(ড. সুভাষ চন্দ্র দাস)

(ড. জয় দাস)

(শ্রী শুভদ্বীপ সরকার)

(শ্রীমতি অন্বেষা বর্মণ)

jobis.bengdc@gmail.com

/বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

/@Department_of_Bengali_DC

সম্পাদকীয়

বাংলা তথা গোটা বিশ্ব জাতি আজ হয়তো সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছে তার সাথে মাটির যোগাযোগ বরাবরই কম। আর এই যোগাযোগকে বাড়িয়ে তোলা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের শিক্ষক ড. সুভাষ চন্দ্র দাস মহাশয় পত্রিকার আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন– ".....আমি মনে করি চৌরাস্তার মোড়ে আড্ডা দেওয়ার চাইতে, এবং নিন্দা চর্চা করার চাইতে; সাহিত্য করা ভালো, সাহিত্য করলে লস্ নাই।" তবে কিছুটা হলেও যদি আমরা সত্যি সত্যিই সাহিত্য করতে পারতাম তাহলে হয়তো চৌরাস্তার মোড়ের আড্ডাটা আড্ডাই রয়ে যেতো বিশৃঙ্খল জটলা হতো না। চারি দিকে ঘটে চলা অসংখ্য অবিচারের বিচার হোক; দুষ্কৃতকারীদের পতন হোক; প্রতিটা রাত সবার হোক।

ধন্যবাদান্তে–
ধৃতিমান চৌধুরী ও শ্রীময়ী সাহা
যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১. “কৃষক ও কৃষির অবস্থা: দিনহাটার দৃষ্টিকোণ” »› অমর বর্মণ	১
২. ‘ফিরে এসো, চাকা’ : একটি পর্যালোচনা »› কেয়া কর্মকার	৫
৩. বাল্যবিবাহ : ফিরে দেখা »› ড. শুচিস্মিতা দেবনাথ	১১
৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : এক বিস্মৃত বাঙালি ঐতিহাসিক »› ড. জয় দাস	১৫
৫. আধুনিকতার উন্নতি নাকি অবলুপ্তি »› পায়েল সাহা	২৬
৬. আধুনিক সমাজে জল সংরক্ষণ »› শ্রীময়ী সাহা	২৮
৭. শিক্ষিত করুন : এডুকেশন ম্যাটার্স »› ধৃতিমান চৌধুরী	৩১
৮. ভাষা ও সমাজ »› দেবব্রত শীল	৩৪
৯. প্রসঙ্গ, পাঠান্তর এবং যুগযন্ত্রণার ‘রক্তকরবী’ »› ড. সুভাষ চন্দ্র দাস	৩৬

কৃষক ও কৃষির অবস্থা : দিনহাটার দৃষ্টিকোণ

অমর বর্মণ
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

মানব সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। প্রতিটি সভ্যতার মূল কেন্দ্রে ছিল কৃষি ও কৃষক। কালের বিবর্তনে অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব কমলেও কৃষির গুরুত্ব আজও অপরিসীম। কৃষকরাই প্রতিটি দেশের উন্নয়নের চালিকা শক্তি। তাঁদের উৎপাদিত ফসল আমাদের খাদ্যের চাহিদা মেটায়। কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব যেমন বিশাল, তেমনই পরিশ্রমও প্রচুর করতে হয়। তবুও, তাঁরা তাঁদের এই দায়িত্ব আনন্দের সাথে পালন করে আসছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, কৃষকরা যেন বলে ওঠেন, “আমরা চাষ করি আনন্দে। মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে ।”

এই মহান কৃষক ও কৃষিকাজ সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানতে আমি কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত কিছু গ্রামের কৃষকদের সাথে কথা বলি। তাদের পরিশ্রম, আর্থিক অবস্থা, চিন্তাভাবনা, আধুনিকতার ছোঁয়া, প্রকৃতি ও সরকারের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে জানার চেষ্টা করি। তাঁদের জীবনযাত্রা, সমস্যাবলী এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আশা করি, এ প্রবন্ধটি পাঠকদের কৃষি ও কৃষকের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেবে।

এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করা হয়। প্রতিটি মৌসুমে নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন করা হয় যা স্থানীয় কৃষকদের জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস। এইদিকে প্রধানত ধান, তামাক, আলু, ভুট্টা, এবং পাট চাষ করা হয়। এছাড়া নদীর তীরবর্তী জমিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি চাষ করা হয়।

কৃষকেরা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল চাষ করেন। উদাহরণস্বরূপ:

ধান: বছরে দুইবার অর্থাৎ শ্রাবণ মাস থেকে অগ্রহায়ণ আমন বা হেমতি এবং পৌষ মাস থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বোরো বা চায়না ধান চাষ করা হয়।
তামাক: শীতকালে চাষ শুরু হয় এবং বসন্তের শুরুতে ফসল সংগ্রহ করা হয়।
আলু: শীতকালে চাষ হয় এবং বসন্তে সংগ্রহ করা হয়।
পাট: বর্ষাকালে চাষ হয় এবং বর্ষার শেষে সংগ্রহ করা হয়।

শাক-সবজি চাষ সারাবছরই বিভিন্ন সময়ে করা হয়। তবে শীতকালেই এর ফলন ভালো হয়। নদীর তীরবর্তী জমিগুলোতে শাক-সবজি চাষ বিশেষভাবে লাভজনক, কারণ এসব জমিতে সেচের সুবিধা বেশি এবং মাটির উর্বরতাও ভালো। উল্লেখযোগ্য কিছু শাক-সবজি হলো - লালশাক, কলমিশাক, ডাঁটা,পেঁয়াজ, পাটশাক, বেগুন, মরিচ, মিষ্টিকুমড়া, করলা,

ধুন্দল, ঝিঙা, চিচিংগা, চালকুমড়া, শসা, ডাঁটা, পুঁইশাক, বরবটি, সজিনা, পটল, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, টম্যাটো, ঢেঁড়স, শিম প্রভৃতি। নদীর তীরে তরমুজ চাষও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এছাড়া কৃষকরা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এসব চাষ করার পাশাপাশি মাছ চাষ, পোল্ট্রি ফার্ম, সুপারি বাগান, লিচু বাগান ইত্যাদি নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন। এসব উদ্যোগ কৃষকদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও জীবিকার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করছে। মাসের নির্দিষ্ট সময়ে কোন ফসল চাষ করা হয় তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ফসলের উৎপাদনশীলতা এবং গুণগত মানের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

এই অঞ্চলের কৃষকরা শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদনে নয়, বৈচিত্র্যময় চাষাবাদেও পারদর্শী। তাদের কঠোর পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলি তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করছে এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষিকাজ অত্যন্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ, বিশেষত ধান চাষের সময়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করতে হয়। সাধারণত, তারা সকাল ৬টায় জমিতে যান এবং সন্ধ্যা ৬টায় বাড়ি ফেরেন। তবে প্রচণ্ড রোদ থাকলে, দুপুর ২টায় বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন। মাথার উপরে সূর্যের তাপ আর জমির জলে প্রতিফলিত সেই রোদে প্রচণ্ড গরম হয়ে যায়। এই জলের মধ্যেই তারা ধানের চারাগাছ রোপণ করেন। ধান চাষের মতো প্রতিটি চাষেই তাদের জন্য আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

পাট চাষের সময় তাদের বৃষ্টিতে ভিজে পাট কাটতে হয়। পাটের আঁশ আলাদা করার জন্য ছোট পুকুর বা নদীতে পাট জাগানো হয়। ছোট পুকুরের জল বের হতে না পারায় পচা পাটের গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। অনেক সময় নদীর স্রোতে পাটের জাগ ভেসে যায়। তামাক চাষের সময় তামাকের গন্ধে মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্টসহ নানা শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এত পরিশ্রমের পরেও আর্থিক উন্নতির অভাবে তাদের মনে হতাশা জন্মেছে। কৃষকরা চান যে তাদের সন্তানরা ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে অন্য পেশায় চলে যাক। তারা কখনোই চান না তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল হোক, কারণ তারা নিজেরা এই পেশার কঠিন জীবনযাত্রা দেখেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা তাদেরকে এই ভাবনা জন্মাতে প্ররোচিত করেছে।

আমাদের গ্রামে কৃষি কাজে ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে, যা কৃষির প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনছে। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হার্ভেস্টার, এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে।এসব যন্ত্রপাতি ফসলের মাঠ চাষ, ফসল তোলা এবং ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণে সাহায্য করে,ফলে কাজের পরিশ্রম

কমে এসেছে এবং উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

ট্রাক্টর ব্যবহার করে জমি চাষ করার ফলে জমি প্রস্তুতিতে সময় ও শ্রম কম লাগে। হার্ভেস্টার মেশিনের মাধ্যমে ফসল তোলার কাজ দ্রুত এবং দক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, যা শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। এছাড়াও, আধুনিক জলসেচ ব্যবস্থা, যেমন বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প ও সৌরশক্তির সেচ পাম্প ফসলের জল প্রয়োজনীয়তা মেটাতে কার্যকরভাবে সাহায্য করছে, ফলে জলের অপচয় কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়।

তবে, এই আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি কেনার জন্য আর্থিক সক্ষমতা অনেক কৃষকের নেই। অনেক সময়, এসব যন্ত্রপাতি কেনার জন্য কৃষকদের ঋণ নিতে হয়, যা পরবর্তীতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ঋণের উচ্চ সুদের হার এবং ফসলের অনিশ্চিত মূল্যস্ফীতি তাদের আর্থিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে।

এছাড়া, যেসব কৃষক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চান, তাদের প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে সেই প্রযুক্তির পুরোপুরি সুবিধা নিতে পারেন না। যদিও সরকার এবং কিছু বেসরকারি সংস্থা কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি ভাড়া নেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে, তবুও আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সামগ্রিকভাবে, আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রামের কৃষিতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। তবে এর সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কৃষকদের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও মনোযোগ প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং কৃষি উৎপাদনশীলতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

কৃষিকাজ প্রকৃতির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। অতি বৃষ্টি, খরা, ঝড়, এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষি কার্যক্রমে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতি বৃষ্টির ফলে জমিতে জল জমে যায়, খরা জল সঙ্কট সৃষ্টি করে, ঝড় ফসলের ক্ষতি করে এবং বন্যা জমির উর্বরতা কমায়। এসব দুর্যোগ কৃষকদের উৎপাদনশীলতা ও আয়কে প্রভাবিত করে, এবং তাদের জীবনযাত্রার ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

সরকারের তরফ থেকে কৃষিভাতা, ঋণ মুকুব, কীটনাশক, সার, যন্ত্রপাতি প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। সঠিক সময়ে সঠিক কীটনাশক ও সার প্রয়োগের সচেতনতার অভাব, কিভাবে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনে লাভজনক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব, এবং একসাথে ৩/৪ টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব—এই বিষয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা নেই। সরকারের পক্ষ থেকে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেক কৃষক নথিপত্রের জটিলতার কারণে অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছেন।অনেক কৃষক

চাষের আগেই পাইকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাষাবাদ শুরু করেন। ফলে কৃষকদের সঠিক মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের সহায়তার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল:

কৃষক বন্ধু প্রকল্প: এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কৃষকরা যদি কোনো দুর্ঘটনায় মারা যান বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হন, তবে তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
মাটি স্বাস্থ্য কার্ড: এই স্কীমের মাধ্যমে কৃষকদের মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে একটি কার্ড প্রদান করা হয়, যা মাটির পুষ্টি সম্পর্কে তথ্য দেয় এবং সঠিক সার ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।
বাংলা শস্য বীমা: এই স্কীমের মাধ্যমে কৃষকদের ফসলের বীমা প্রদান করা হয়, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেয়।
কৃষি যান্ত্রিকীকরণ: এই স্কীমের মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ভর্তুকি প্রদান করা হয়।
কৃষি পাঠশালা: এই স্কীমের মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সরকারের আরও সচেতন হওয়া উচিত যাতে কৃষকরা তাদের ফসলের সঠিক দাম পান এবং কৃষকদের উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সেচ পদ্ধতি, এবং জৈব কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া, ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমাতে সরাসরি বাজার ব্যবস্থার উন্নতি করা উচিত। এর পাশাপাশি, ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সুবিধার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা নথিপত্রের জটিলতায় না পড়ে সহজেই সব সুবিধা পেতে পারেন।

কৃষি আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ এবং এর উন্নতি দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সরকারের সহায়তা কৃষি ক্ষেত্রকে আধুনিকীকরণ ও উন্নত করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের সহায়তা ও সহযোগিতা অপরিহার্য। আশা করা যায় যে, এসব উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষি খাতের উন্নতি সাধিত হবে এবং কৃষকরা তাদের পরিশ্রমের ফলাফল সঠিকভাবে পাবেন।

‘ফিরে এসো, চাকা’ : একটি পর্যালোচনা

কেয়া কর্মকার
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

কবি বিনয় মজুমদারের কাব্য সৃষ্টির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ ‘ফিরে এসো, চাকা’ (১৯৬২) কাব্যটি। কাব্যটি কবির রচিত তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থটিতে রয়েছে মোট ৭৭ টি কবিতা। কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি দিনপঞ্জির আকারে লিখিত এবং প্রত্যেকটি কবিতা স্বয়ং সম্পূর্ণ অথচ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। কাব্যগ্রন্থটি শুরু হয়েছে ‘৮ মার্চ ১৯৬০’ কবিতাটি দিয়ে এবং সমাপ্ত হয়েছে ‘২৯ জুন ১৯৬২’ কবিতাটি দিয়ে। অর্থাৎ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি প্রায় তিন বছররের সময়কালকে তুলে ধরেছেন।আবার দিনপঞ্জির আকারে কবিতাগুলির নামকরণ কাব্যগ্রন্থটিকে ভিন্নতা প্রদান করেছে। তবে কাব্যগ্রন্থের ‘ফিরে এসো,চাকা’ নামকরণের মধ্য দিয়ে কবি কাকে স্মরণ করেছেন ? কাকেই বা ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন? এ সকল বিষয় জানার আগে কবির ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে জেনে নেওয়া আবশ্যিক। বা বলা যায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর কবির ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

কবি বিনয় মজুমদার অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫১ সালে আই.এস.সি (গণিত) পড়ার জন্য তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। আর এই সময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী গায়েত্রী চক্রবর্তীর প্রেমে পড়েন। তবে সে প্রেম ছিল সম্পূর্ণ এক পাক্ষিক। কবি নিজের মনের কথা গায়েত্রী চক্রবর্তীকে জানিয়ে উঠতে পারেননি। যে সময় তিনি নিজের মনের কথা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন সে সময় গায়েত্রী চক্রবর্তী পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় চলে যান। আর সেখানেই এক বিদেশি পুরুষকে বিয়ে করেন ও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন পরিচয় গড়ে উঠে গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নামে। আর কবি মন ডুবে যায় চির বিরহের সাগরে। নিজের ভালোবাসাকে না পাওয়ার বেদনা কবিকে প্রত্যেক মুহূর্তে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন তিনি। তুমুল মেধাবী কবিই তাঁর জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছেন অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায়। একাধিকবার তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। আট বারেরও বেশি তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।একত্রিশবার ইলেকট্রিক শক দিতে হয়েছে। নিজের মনের এই না পাওয়ার বেদনাই ‘ফিরে এসো, চাকা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা গুলিতে উঠে এসেছে। প্রায় তিন বছরব্যাপী সময়ে রচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির সময় কালের ব্যবধানের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা কারণে ক্রমাগত তিনি কবিতা গুলো লিখে যেতে পারেননি। কাব্য গ্রন্থের পূর্ব নামকরণ করেছিলেন ‘গায়েত্রীকে’(১৯৬১)। পরবর্তীতে তিনি ‘ফিরে এসো,চাকা’ নামে ৭৭টি কবিতা সংকলন হিসেবে বইটি প্রকাশ করেন এবং উৎসর্গ পত্রে লেখেন- ‘গায়েত্রী চক্রবর্তী’। অর্থাৎ গায়েত্রী চক্রবর্তীই যে কবির এই কাব্যগ্রন্থের অনুপ্রেরণা সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমন কি মনে করা হয় ‘ফিরে এসো, চাকা’ কাব্যগ্রন্থের চাকা শব্দটির দ্বারা কবি

গায়েত্রী চক্রবর্তীকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আবার ভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায় 'চাকা' শব্দটি গতির সঙ্গে সম্পর্কীত।'চাকা' হলো চালিকা শক্তি। কবি জীবনের সেই চালিকাশক্তি বা গতি হিসেবে কাজ করেছেন গায়েত্রী চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত মনে পরে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিখ্যাত লাইন—

"বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভালো- ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়"।১

গায়েত্রী চক্রবর্তী কবি বিনয় মজুমদারের কাছে বুকে জমে থাকা সেই পাথরের মতো, যার প্রতিধ্বনি তিনি 'ফিরে এসো,চাকা'র কবিতায় প্রকাশ করছেন।

সেই সুদূর আদি-মধ্য যুগ থেকে দেখা যায়, বিরহই প্রেমকে অমর করেছে । রাধা কৃষ্ণ একে অপরকে পায়নি, অথচ তাদের কথাই আবহমান কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। আসলে বিরহে প্রেমের সার্থকতা। ব্যর্থতার মধ্যেও রয়েছে সফলতার আস্বাদ। কবির ব্যর্থ প্রণয়ের বিরহী মন তাঁর সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। বাস্তবে না পাওয়া মানুষটি কল্পনায় প্রতিনিয়ত হাতছানি দেয়। আর কবিমন তাঁকে সৃষ্টির মধ্যে অমর করে রাখে। হয়তো প্রত্যেক কবির কল্পনায় এমন একজন করে থাকেন। যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মানস সুন্দরী', জীবনানন্দের 'বনলতা সেন', যার চোখে তিনি দু দন্ডের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীরা', যার সাথে কবির বাসস্টপে দেখা। কবি বিনয় মজুমদারের কাছেও গায়েত্রী চক্রবর্তী অনেকটা সেই 'মানস সুন্দরী'র মতো । যার সাথে কবি কল্পনায় মিলিত হতে চান। 'ফিরে এসো, চাকা'র '৮ই মার্চ ১৯৬০' প্রথম কবিতার শেষ লাইনে লিখেছেন—

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

"তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা"।২

কবি মনে মিলনের আকাঙ্খা কবিতায় স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ব্যর্থ প্রণয় জীবন কবিকে হতাশার সম্মুখীন করেছে বারবার। কবিকে ক্ষয়িত করেছে ভেতরে ভেতরে সেই ভাবনারই পরিচয় পাওয়া যায় –"২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬০" কবিতায়। কবিতার শুরুতেই কবি বলেছেন অনেক পতঙ্গ শিকারী ফুল আছে যাদের কবি চোখে দেখেননি । অথচ তাবুর ভেতর শুয়ে অন্ধকার আকাশের ক্রম বিস্তার লাভ করেছে। আসলে কবি যেনো বলতে চেয়েছেন তিনি পতঙ্গ শিকারী ফুল না দেখলেও নিজে পতঙ্গের মতো ফুল অর্থাৎ নিজের প্রেমিকার কাছে ধরা দিয়েছেন। সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। জেনেছেন বাস্তব সত্য। যাকে তিনি উজ্জ্বল তারা মনে করেছেন সে আসলে 'তাপহীন আলোহীন গ্রহ'। তিনি হয়তো 'তাপহীন আলোহীন গ্রহ' কথাটির মধ্য দিয়ে প্রেমিকার উত্তাপহীন হৃদয়ের কথা বলতে চেয়েছেন। এই ব্যর্থতা তাকে হতাশ করেছে ক্রমে—

"শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।

অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি।
তাবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি ...
আমিও হতাশবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হ'য়ে
মাটিতে শুয়েছি একা- কিটদষ্ট নষ্ট খোশা, শাঁস ।
হে ধিক্কার আত্ম ঘৃণা দ্যাখো, কী মলিন বর্ণ ফল"।(২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬০)।৩

এই ব্যর্থতাই তাঁর কবিতার প্রেরণা স্বরূপ। কবি এই এই কবিতায় বলেছেন কিছুকালের জন্য সুনির্মল জোৎস্না অর্থাৎ ভালোবাসা তার জীবনে এসেছিল। কিন্তু পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনি তা উড়ে গেছে । আসলে গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁকে ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। তিনি জানেন মানুষের পরিস্থিতি সব সময় সমান থাকে না । কখনো তা বিষাক্ত, আবার কখনও বা সুগন্ধি অর্থাৎ ভালো মন্দ উভয়ে মিলিয়েই মানুষের জীবন। তাই নিজের এই দুঃখময় পরিস্থিতিতে কবি নিজেকেই ধিক্কার জানিয়ে ভুলতে চেয়েছেন পুরোনো স্মৃতি—

" অতএব, হে ধিক্কার , বৈদ্যুতিক আক্ষেপ ভোলো তো,
অতি অল্প পুস্তকেই ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে"।৪ (২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬০)

কিন্তু কবি নিজেকে যতই ধিক্কার জানিয়ে পরিস্থিতি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেনো প্রকৃত পক্ষে তিনি এই বেদনা কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। এই বেদনা বুকে নিয়েই তিনি লিখেছেন। এই বেদনার বাকি কণা তাঁর কাব্যের মণি-মুক্তা হয়ে উঠেছে—

"ব্যর্থ হও, তবু বালি, ভিতরে প্রবিষ্ট বালিটুকু
ক্রমে ক্রমে মুক্তা হ'য়ে গতির সার্থক কীর্তি হবে"। ৫ (১৩ জুন ১৯৬১)

আরও একটি কবিতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর এই ব্যর্থ প্রণয় তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ করেছে—

"আর আমি অর্ধ মৃত; বৃক্ষদের ব্যাপক অসুখ
শুশ্রুষা করার মতো অনাবিল প্রিয়জনও নেই"। (১২ এপ্রিল ১৯৬২) ৬

আবার সেই ব্যর্থ প্রণয়ই তাঁর কবিতার প্রেরণা –

"বিনিদ্র রাত্রির পরে মাথায় জড়তা আসে, চোখ জ্বলে যায়,
হাতবোমা ভ'রে থাকে কী ভীষণ অতিক্রান্ত চাপে।
এ রকম অবস্থায় হৃদয়ে কিসের আশা নিয়ে
কবিতার বই, খাতা চারিপাশে খুলে ব'সে আছি?" (১৫ অক্টোবর ১৯৬০)৭

আবার কখনও বা তিনি আশাবাদী মনোভাব নিয়ে লিখেছেন—

"..... অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বুঝি; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো..."(২০ জুলাই ১৯৬১) ৮

গায়েত্রী চক্রবর্তী বিদেশে চলে যাওয়ার পর সেখানেই বিয়ে করে সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। কবি এসকল কথা জানা সত্ত্বেও কবিতায় একথা স্বীকার করেছেন তিনি তাকেই ভালোবাসেন '১৯ জুলাই ১৯৬১'—

"বেশ কিছুকাল হ'লো চ'লে গেছো, প্লাবনের মতো
একবার এসে ফের;.....

প্রেমের দ্বারে বারবার করাঘাত করে কবি ব্যর্থ হয়েছেন। তিন পা পিছনে ফিরে এসেছেন কিন্তু যখনই তার প্রণয়িনীর কথা মনে পড়েছে তখনই আবার তার কাছে ফিরে গেছেন। আসলে তিনি দুঃখ পেলেও পরিবর্তে ভালোবাসই ফিরিয়ে দিয়েছেন বারবার। কবি যে তাকে ভুলতে পারবে না একথাও বলেছেন –

"তিন পা পিছনে হেঁটে পদাহত হ'য়ে ফিরে আসি।
আবার তোমার কথা মনে আছে ; ধূমকেতুর মতো
দীর্ঘকাল মনে রবে তোমাকে; ..." (২৩ জুলাই ১৯৬১) ১০

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

এই কবিতাটি লেখার পর কবি শারীরিক ভাবে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর দীর্ঘ ৬ মাসের ব্যবধানে পরবর্তী কবিতা লেখেন '২৭ জানুয়ারি ১৯৬২'। গায়েত্রীর প্রেমে, বিচ্ছেদে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছেন তিনি। আর সেই ভস্মাগ্নি থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার অমর সৃষ্টি। যা তাঁকে ও তাঁর গায়েত্রীকে অমর করে রয়েছে।একজন কবিকে চিন্তার গভীরে নিয়ে যায় যে অন্তর্দাহ, তা বিনয় মজুমদারের কবিতায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এমনই অন্তর্দাহ লক্ষ্য করা যায় কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও। তাই তিনি হয়তো লিখেছেন-

"ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,

ঘৃণা করে চলে গেছে- যখন ডেকেছি বারে- বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিল একদিন – এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি; যে নক্ষত্র- নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার- বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা- ধুলো আর কাদা- ।..(বোধ)" ১১

পাশ্চাত্য সাহিত্যিক টি.এস এলিয়টের কবিতায় কবি মনের এই অন্তর্দাহের বিষয়টি লক্ষ্যনীয়।

কবি বিনয় মজুমদার এক সময় গায়েত্রীকে খুঁজতে খুঁজতে অন্য এক গায়েত্রীর সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কবি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ব্যথিত ভগ্ন হৃদয় নিয়ে বারবার ছুটে গেছেন তার গায়েত্রীর কাছে। সেখানে কোনো রূপ সমাদর তিনি পাননি। তবু তিনি নিজের ভালোবাসার ডালি নিয়ে গেছেন। পত্রবাহক যেমন করাঘাত দিয়ে গৃহস্থকে পত্র প্রেরণ করে , তেমনি তিনি গায়েত্রীর মনের দরজায় করাঘাত করেছেন কিন্তু কোনো সমাদর পাননি। কবি মনের এই অবস্থা '১১ই মার্চ ১৯৬২' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে –

"তোমার নিকটে আসি, সমাদর নেই তবু সবিস্ময়ে আসি,
পত্রবাহকের মতো কাষ্ঠময় দরজায় করাঘাত ক'রে।
তোমাকে ঘুমের থেকে অবিন্যস্ত অবস্থায় বাহিরে এনেছি।
আমরা যে জোৎস্নাকে এত ভালবাসি – এ গাড়ি রূপকথা
চাঁদ নিজে জানে না তো; না জানুক শুভ্র ক্লেশ, তবু অসময়ে
তোমার নিকট আসি, সমাদর নেই তবু আসি"।১২

এই ব্যর্থতা মাঝে মাঝে কবিকে ক্ষুদ্ধ করে তুলেছে । কবি ভেবেছেন আর ফিরে যাবেননা সেই পথে। ভাববেন না আর প্রণয়িনীর কথা। কিন্তু পুনরায় তার কাছেই ফিরে গেছেন। বেদনা দীর্ণ হৃদয় নিয়ে আকুলভাবে ডেকেছেন তার প্রণয়িনীকে। ৭০ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন-

"আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছো; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা
রথ হ'য়ে, জয় হ'য়ে চিরন্তন কাব্য হ'য়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো অবয়বহীন
সুর হ'য়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে"। (৭ জুন ১৯৬২) ১৩

এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি স্পষ্টই যেনো গায়েত্রী চক্রবর্তীকে ফিরে আসার কথা বলেছেন। এক সময় যে গায়েত্রী আমেরিকায় চলে গিয়েছে তাকেই তিনি ফিরে আসতে বলেছেন রথ হয়ে, জয় হয়ে , চিরন্তন কাব্য হয়ে । কাব্যগ্রন্থের 'চাকা' শব্দটি তারই পরিচয়বাহী । কবির কাব্য সৃষ্টি যেমন চিরন্তন তেমনি চিরন্তন কবির এই ব্যর্থ প্রণয় যা কাব্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা । আসলে হতাশা , বিষন্নতা , প্রত্যাখ্যান , বিরহ-দাহ এক ধরনের মনোবিকারের জন্ম দেয় । এই মনোবিকারই প্রকৃত কবির সৃজন যন্ত্রণার সময়কার। আসলে কবি মনের এই বেদনা শুধু এক নারীকে না পাওয়ার বেদনা নয়, তা শিল্পীর চিরবিরহী আত্মার ক্রন্দন। তাই কবির এইবিরহ, দুঃখ ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীন। এখানেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রেষ্ঠ কবিতা, চট্টোপাধ্যায় শক্তি , দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশ- মার্চ ১৯৭৩, ফাল্গুন ১৩৭৯, পৃ: ৬৫

২. ফিরে এসো, চাকা, মজুমদার বিনয়, অরুণা প্রকাশনী, প্রকাশ: প্রথম অরুণা সংস্করণ - অগ্রহায়ণ- ১৩৮৩, পৃ: ৯।

৩.তদেব, পৃ: ১০

৪. তদেব, পৃ: ১১

৫. তদেব, পৃ: ১৪

৬. তদেব, পৃ: ৪০

৭. তদেব, পৃ: ১৩

৮. তদেব, পৃ: ২১

৯. তদেব, পৃ: ২০

১০. তদেব, পৃ: ২৫

১১. শ্রেষ্ঠ কবিতা, দাশ জীবনানন্দ, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল – জুলাই ২০১৭ , শ্রাবণ ১৪২৪ , পৃ- ৫৮-৫৯ ।

১২. ফিরে এসো, চাকা, মজুমদার বিনয়, অরুণা প্রকাশনী, প্রকাশ: প্রথম অরুণা সংস্করণ অগ্রহায়ণ-১৩৮৩ , পৃ: ৩১-৩২

১৩. তদেব, পৃ: ৪৯

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

বাল্যবিবাহ : ফিরে দেখা

ড. শুচিস্মিতা দেবনাথ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারীর ভাগ্য জয় করে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বপ্ন দীর্ঘকালের। নারী প্রথমে মানুষ, তারপরে নারী। এই কথাটি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ইতিহাস অনেক বিদুষী নারীদের কথা বললেও 'খনা'র জিভ কেটে তাকে বাকশক্তি রহিত করে দেবার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে নারীকে অবদমিত করে রাখবার অপচেষ্টা। 'বিবাহ' শব্দটি তার অন্তর্নিহিত অর্থ বন্ধনের মধ্য দিয়ে কিভাবে নারীদের বদ্ধ অবস্থার মধ্যে এনে ফেলতে বাধ্য করল তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে।

বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত রীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 'বিবাহ'। বিবাহ সুমধুর, কিন্তু তৎকালীন বিবাহ ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত একটি প্রথা, যা নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মান দেবার কথা ভাবতে পারত না। এই বিবাহ ছিল অবশ্যই বাল্যবিবাহ। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র 'মনুসংহিতা'য় মনু যে বিধান দান করেছেন তার ওপর ভিত্তি করেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যাবতীয় রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম এমনকি সামাজিক ভাবে যাপিত জীবন কেমন হবে তা ঠিক করতো। নারী ঋতুমতী হলেই তাকে বিবাহ দিতে হবে এমনকি বারো বছরের মধ্যেই কন্যার বিবাহদান অবশ্যম্ভাবী বলে মনু বলেছেন। কোন কন্যা প্রজননক্ষম হলেও যদি তার পিতা বিবাহ দিতে দেরী করেন তবে লোকসমাজে তিনি নিন্দনীয় হবেন। আবার উপযুক্ত পাত্র পেলে ঋতুমতী না হলেও কন্যাকে তার পিতা অল্প বয়সেই পাত্রস্থ করতে পারবেন বলে মনু মত জ্ঞাপন করেছেন।এভাবেই সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথার প্রচলন ঘটে। আবার যেসমস্ত পিতা-মাতা কন্যাকে বাল্যকালে বিবাহ দিতে চাইতেন না, তারাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্তচক্ষুর অনুশাসনকে অবহেলা করতে না পেরে কন্যার বাল্যবিবাহ দিতে বাধ্য হতেন। আর এই প্রথার হাত ধরেই চলে আসে বাল্য বিধবার কথা। অনেক সময় কন্যার নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে যদি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান না পাওয়া যেত তবে বলতে গেলে অপাত্রেই কন্যাদান করতে হতো। অপাত্র বলতে বোঝায় অকর্মণ্য ও অধিক বয়স্ক ব্যক্তি। অনেক বৃদ্ধ লোকেরও এই রীতির ফলে অল্প বয়সী পত্নী হতো, আর কন্যাদের সংসার ও জীবন সম্পর্কে বোধ তৈরি হবার পূর্বেই স্বামীর মৃত্যুতে বৈধব্য জীবন গ্রহণ করতে হতো।

মধ্যযুগের সাহিত্যেও এই গৌরীদান প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর রচিত 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে বলেছেন - "শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্যবিবাহ সংস্থাপনা

নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধি কৌশলে এমত কঠিনতর অধর্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্মিনী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃমাতৃ উভয় কুলের কলঙ্কস্বরূপা হইয়া সপ্তপুরুষ পর্যন্তকে নরকগামী করে, এবং তাহার পিতামাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাংক্তেয় হয়।" শাস্ত্রকার প্রদত্ত এই সমস্ত সামাজিক অনুশাসন সমূহ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হোত। সমাজে পদস্খলনের ভয়েই ক্রমাগত বাল্যবিবাহ প্রথার বিস্তার ঘটে। বাল্যকালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ফলে বাড়ির বয়স্কা মহিলারা নববিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে নানা স্থূল রঙ্গরসিকতা ও কামকলা নিয়ে চর্চা করে তাদের স্বাস্থ্যকর চিন্তা ভাবনার অযোগ্য করে তুলতেন। এর ফল স্বরূপ বিদ্যাশিক্ষায় প্রায়শই নিরুৎসাহী হযে পড়তেন তরুন সমাজ। বিদ্যাশিক্ষার প্রসার না ঘটায় কুসংস্কার আরো গভীরভাবে সমাজের বুকে প্রোথিত হয়। পুরুষরাও অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে পরিবার, সংস্কার, সামাজিক অনুশাসন এসবে নজর দিতে উৎসাহী হয়ে পড়ে। আবার এমনও হয়েছে মা-বাবা ছেলেকে বিয়ে দিতে না চাইলেও সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে আর আত্মীয় পরিজনদের তৎপর মনোভাবের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হোত।

বাল্যকালে বিবাহ হওয়ার ফলে পরিবারের লোকেরা বিবাহবিধি লাভ করতে চাইতেন নিয়ম মেনে অর্থাৎ কিনা দাম্পত্য যাপন। ফলে স্বামীর কামনা বাসনার শিকার হয়ে অনেক নারীকে আত্মাহুতিও দিতে হয়েছে। ১৮৮৯ সালে ঘটেছিল সেধরনের একটি ঘটনা। মাত্র দশ বছর বয়সে ফুলমণি দাসীর সাথে তিরিশ বছরের যুবক হরিমোহন মাইতির বিবাহ হয়। দাম্পত্য জীবনের প্রথম রাতেই স্বামীর যৌনলালসার শিকার হতে হয় স্ত্রী ফুলমণিকে, অবস্থা গুরুতর হয়ে শেষ অবধি তার মৃত্যু ঘটে। 'দ্য ফুলমণি দাসী রেপ কেস' নামে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ভারতীয় আইন জগতে এটি পরিচিত ছিল। বাল্যকালে বিবাহ হওয়ার ফলে অনেকে বালিকা অবস্থায় সন্তান জন্ম দিতে গিয়েও মৃত্যুমুখে পতিত হোত। আবার রুগ্ন ও দুর্বল শরীরে যে সন্তান জন্ম দিত সে সন্তানও রোগগ্রস্ত হোত। কিন্তু তাদের সন্তান জন্মদানে বিরতি পড়ত না, ফলে প্রকারান্তরে জীবন্মৃত হয়ে সেসব নারীরা বেঁচে থাকতেন। সন্তান জন্মদান, সন্তান পালন ও গৃহকর্ম এসবের মধ্যেই বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধবয়স অবধি নারীরা তাদের জীবন অতিবাহিত করতো। সেখানে খোলা আকাশ, বিদ্যাশিক্ষা, কুসংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে চিন্তা ভাবনা করার কথা নারীরা ভাবতে তো পারতই না বরং কেউ তা ভাবলে তাকে সমাজ নানাভাবে দাবিয়ে রাখতে সচেষ্ট হোত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে বলেছেন - "বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাকচাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির

অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ব থাকে, এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়-পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিজ্ঞালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্য গণনায় পরিগণিত হয় না।"

মহর্ষি মনু সমাজে নারীদের কাজকর্ম পর্যন্ত স্থির করে দিয়েছেন। সাংসারিক কর্মে প্রতি নিয়ত নিরত থাকা, পরিবারের গুরুজনদের সেবা করা, স্বামীকে বিশেষভাবে যত্ন আত্তি করা, পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া ও তাদের লালন পালন - এসকল কর্মই স্ত্রীজাতির প্রধান করণীয় বলে নির্দিষ্ট করেছেন। শাস্ত্রকারের এ সমস্ত বিধান থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, নারীরা সংসারে দাসীদের মতো এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হতেন। বাল্যবিবাহের ফলে দশ বারো বৎসর থেকেই তাদের এই জীবনযাপন চলতো। নারীর আলাদা কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল বললেই চলে।

রাসসুন্দরী দাসী তাঁর 'আমার জীবন' নামক আত্মকথনমূলক গ্রন্থে বাল্যবিবাহের পর তাঁর জীবনচর্যা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা লিখেছেন তা থেকে তৎকালীন গৃহস্থালির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহিতা রাসসুন্দরীকে তার শাশুড়িমা কোন কাজ করতে দেননি প্রথম কয়েক বছর। কিন্তু পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়াতে রাসসুন্দরীকেই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়। একান্নবর্তী শ্বশুরবাড়িতে দাসদাসীও ছিল প্রচুর। সকল কাজে সহযোগিতা করলেও গৃহের রান্না বান্নার কাজে অর্থাৎ গৃহস্থালির কাজে দাসীদের হাত লাগানো বারণ ছিল। ফলে সংসারের সমস্ত লোকেদের রান্নাবান্না, গৃহদেবতার অন্ন-ব্যঞ্জন ভোগ, সন্তান পালন সবকিছু তাকে একা হাতে করতে হোত। এমনও হয়েছে পরপর দুদিন তিনি কর্মব্যস্ততার জন্য খাবার খেতে সুযোগ পর্যন্ত পাননি। আবার সমস্ত গৃহকর্ম সমাপন করে রাসসুন্দরীকে স্বহস্তে শাশুড়ির সেবাও করতে হোত। তিনি আরো জানিয়েছেন, আঠারো থেকে একচল্লিশ বছরে সব মিলিয়ে বারোটি সন্তানের জন্ম তিনি দিয়েছেন। তাঁর লেখনীতে - " আমি এই ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম। ঐ ছেলে কয়েকটি না উঠিতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ানো হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ-সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়া আমাদের ঘরের রান্নার সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। সে পাকও নিতান্ত কম নহে। এক সন্ধ্যায় দশ বারো সের চাউল পাক করিতে হইত।" - এইভাবে নারীদের সংসার ধর্মে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন লাগানো হত বলে তাদের পক্ষে এর বাইরে বেড়িয়ে এসে নতুন করে কোন ভাবনার দিগন্ত খুলে দেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। এই সংসার বন্ধনে সহায়ক হিসেবে কাজ করতো আরও বেশ কিছু মহিলা। যেমন - শাশুড়ি, পিসিশাশুড়ি, দিদিশাশুড়ি প্রমুখরা। তারাও অসামান্য দাপটের সঙ্গে পরিবারের বউদের দাসীর মতো খাটাতে ভালোবাসত।

বাল্যবিবাহের দোসর ছিল বালবিধবা। সেকালে এদেশে বালবিধবা নারীর সংখ্যা যথেষ্ট

পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ হচ্ছে কৌলিন্য প্রথা। অনেক পিতা কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের জন্য উপযুক্ত বয়সের পাত্র না পেয়ে বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ এমনকি মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধকেও বেছে নিতেন পাত্র হিসেবে। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্বর সেই কন্যাটি বিধবা হতেন। অনেক কঠিন বৃত-অনুশাসন সেসময়কালে বিধবা নারীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। যেমন - বালবিধবা থেকে বৃদ্ধা সকলেরই মস্তক মুন্ডন করানো হোত, নিরলাঙ্কারা হয়ে সাদা শাড়ি পরিধান করতে হোত, যাতে কোন পুরুষ এইসব নারীদের রূপ কি তা না বুঝতে পারে। একাদশীর দিন নিতান্ত বালিকাকেও নির্জলা উপবাস থাকতে হোত। অনেকে একাদশী ব্রত পালন করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তথাপি তাদের মুখে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। কারণ হিসেবে দর্শানো হোত যে, এভাবে জীবন-যাপন করলে বিধবা নারীর কামনা-বাসনার সংযম হয় এবং তাদের আয়ুক্ষয় হয়। আর এইসব নারীদের নিজেদের সংসার না থাকায় চিরকাল অন্যের আশ্রিতা হয়ে, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করে জীবন অতিবাহিত করতে হোত। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সব নারীদের দুর্ভোগময় জীবনের বিনাশে উদ্যোগী হয়ে অনেক পরিশ্রম করে শাস্ত্র ঘেঁটে তথ্য আবিষ্কার করে বিধবা বিবাহ আইন চালু করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত নানা কষ্টকর জীবনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উঠে এসেছে নারীদের কথা। একমাত্র শিক্ষার আলোর দ্বারা এই ঘন তিমির বিদারণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের এই বিশাল সমস্যার নিষ্পত্তি হয়েছে কি, হয়তো নয়। আজও গ্রামে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক বাল্যবিবাহ ঘটে চলেছে। যে স্থানগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে যে, সেই শিক্ষার আলো এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে পুনরায় সমস্যাগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। আইন করে এসব বিষয়গুলো নিবারণ করার চেষ্টা করা হলেও সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তিদের অবশ্যই এসব লহে এগিয়ে আসা উচিত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : এক বিস্মৃত বাঙালি ঐতিহাসিক

ড. জয় দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

এক

যিনি অভিশপ্ত ও কলঙ্কিত ইতিহাসকে পুনর্জীবিত করতে পারেন, যিনি সত্যকে সমাদৃত করতে পারেন তিনি মরতে পারেন না। দোয়া করুন, আপনার চিন্তা ও চেতনাকে আমি যেন কাব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। ১

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)-র চিন্তা চেতনাকে সম্মান জানিয়ে কবি নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬) একবার লিখেছিলেন এভাবেই। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 'বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর'-এর প্রতিষ্ঠা করে, তিনি রবীন্দ্রযুগেই বাংলার বিদ্বৎ সমাজের প্রশংসা লাভ করেছিলেন। পেশায় রাজশাহী আদালতের আইনজীবী এবং আমৃত্যু এই পেশার সাথে বেশ সুনামের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই তাঁর ছিল সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং এ শিক্ষা তিনি পান তাঁর পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় ও তাঁর পিতৃসুহৃদ বাংলাসাহিত্যে পরিচিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের(১৮৩৩-১৮৯৬) কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিজেই বলেন- 'ইতিহাসের প্রতি, পিতার ন্যায় আমারও কেমন আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, অবসর পাইলেই ইতিহাস পড়িতাম; কেহ প্রবন্ধ লেখবার জন্য তাড়না করিলেও তাহাই লিখিতাম।'২

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

ছোটোবেলায় তিনি যে 'বঙ্গবিজয়' নামে কবিতাটি রচনা করেন, পরে যেটি ১৩১০ সনে অগ্রহায়ণ মাসে 'বঙ্গদর্শন'-এ 'বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়' নামে প্রকাশিত হয়। তারও বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাসধর্মী। খিলজির বঙ্গবিজয়-এর ১৭ জন অশ্বারোহীর কাহিনী যে সত্যি নয় তাই তিনি বলার চেষ্টা করেন কবিতার মধ্যে। 'অক্ষয়কুমার' নামটিও তাঁকে দেওয়া হয় অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০- ১৮৬৬) নামানুসারে; যিনি প্রথম বাংলার সামাজিক ইতিহাসের টুকরো টুকরো বিবরণ লিখে রাখেন তাঁর লেখনীতে। হরিনাথ মজুমদার ও মথুরনাথ মৈত্রেয়ের আদর্শ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)।৩ ছাত্রজীবন থেকেই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যেমন ছিলেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ('গ্রামবার্তা' 'জ্ঞানাঙ্কুর' 'উৎসাহ', 'শিক্ষা-পরিসর' প্রভৃতি), তথা ইতিহাস ও সাহিত্যের সাথে যুক্ত ঠিক তেমনি ছিলেন অনিসন্ধিৎসু মনের অধিকারীও। তাই তিনি এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ বা অন্যান্য ঐতিহাসিকদের রচনায় এ দেশের সম্পর্কে যা বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা শুধু একপেশেই নয়, অনেকাংশে মিথ্যাও। এই কারণে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ইতিহাস চর্চায় এবং মেতে উঠেছিলেন সত্য উদ্ধারের নেশায়। এফ. এ. পড়বার সময়ই তিনি অধ্যাপক ডাউনিং সাহেবের সাথে তর্ক করেন মেকেলের ভারত বর্ণনার সত্যতা নিয়ে।৪ তাছাড়া হান্টারের উক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অক্ষয়কুমারকে আলোড়িত

করেছিল। উইলসন হান্টার সাহেব(১৮৪০-১৯০০) বলেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই কারণ এদেশে ইতিহাস লেখার মতো শিক্ষিত ব্যক্তি এখনও কেউ হয়নি।'৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বলেছিলেন- 'গ্রিনল্যান্ড, মাওরিজাতির পর্যন্ত ইতিহাস আছে কিন্তু বাংলার ইতিহাস নেই'৬ এই বক্তব্য তাঁকে বাংলার ইতিহাস খুঁজতে উৎসাহী করে তোলে। 'আমাদের ইতিহাস নেই' কারণ হিসেবে অক্ষয়বাবু বলেন- 'উপাদানের অভাবকে ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; অনুসন্ধান চেষ্টার অভাবই প্রধান অভাব।'৭

অক্ষয়বাবুর ইতিহাসচেতনার মধ্যে প্রথমেই যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় সেটি হল তিনি বিদেশি ঐতিহাসিকদের প্রচলিত রীতিকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তথা ও তত্ত্বের পরীক্ষা ও তারপর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আচার্য যদুনাথ সরকারের (১৮৭০-১৯৫৮) জীবনীকার মণি বাগচী(১৯০৫-১৯৮৩) মন্তব্য করেন- 'তখনকার ইতিহাস-লেখকদের ... অনেকে ফরাসী বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতেন, কখনও বা সোজা অনুবাদ করে নিজের নামে চালিয়ে দিতেন। এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়...।'৮

দ্বিতীয়ত তিনি সঠিক অনুভব করেছিলেন একা ইতিহাস খোঁজা বা পুনরুদ্ধার দুঃসাধ্য কাজ। তাই 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত' নামক প্রবন্ধে 'ইতিহাস সমিতি' নামের জাতীয় কোন সমিতি গঠন করে তিনি ইতিহাস সঙ্কলনের প্রস্তাব পেশ করেন।৯ পরে নিজেও 'বরেন্দ্র অনুশীলন সমিতি' গঠন করে তার বাস্তব রূপ দেন। তৃতীয়ত তিনি দেশের ইতিহাস খোঁজার আগে আঞ্চলিক ইতিহাস খোঁজার কথা বলেন। স্বদেশের প্রতি তীব্র ভালোবাসা তাকে প্রবলভাবে ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কোনো খ্যাতি বা সম্পত্তির লোভ তাঁর ছিল না। তাই তো তিনি সেই সময় পাঠ্যপুস্তক লেখার একলক্ষ টাকার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। কারণ 'আত্মবিক্রয়' করে 'অসত্য ইতিহাস' লিখতে তিনি রাজী নন। ১০ ফলে তাঁর ইতিহাস ভাবনাকে অনেকে জাতীয়তা প্রীতির বাড়াবাড়ি বলেও মনে করেছেন (যেমন আচার্য যদুনাথ সরকার"১১)। কিন্তু তাঁর রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি পড়লেই বোঝা যায় সেখানে ভাবালুতা থাকলেও সেগুলি সূক্ষ্ম ও তীব্র যুক্তি দ্বারা সাজানো। অক্ষয়বাবু মনে করতেন বাংলার ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙালির জনসাধারণের কথা।"১২ আর তিনি বোধহয় প্রথম ঐতিহাসিক যিনি সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে একটা সরস সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাই আচার্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত আমরাও বলতে পারি- 'মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঐতিহাসিক তখন বাংলার কাহিনী লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন।... ঐতিহাসিক সত্যকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আর কেহ তাঁহার (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) মত করিয়া বাঙ্গালার ইতি-কথা শুনাইতে পারিতেন বলিয়া মনে পড়ে না।'১৩

এই সকল কারণে উনিশ শতকে এক অনন্য ঐতিহাসিক রূপে নিজের স্বতন্ত্রতা তৈরি করতে পেরেছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তাঁর রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' (২১ শে জানুয়ারি,

১৮৯৮ সাল), 'মীরকাসিম' (২৫ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ সাল), 'ফিরিঙ্গি বণিক' (২০ শে জুলাই, ১৯২২ সাল), 'গৌড়লেখমালা' (১লা সেপ্টেম্বর ১৯১২ সাল) প্রভৃতি গ্রন্থাবলী যার উদাহরণ স্বরূপ।

দুই

ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রথম যেদিন বাণিজ্য করতে এসেছিল তার মধ্যে ছিল লোলুপতা; ভাস্কো-দা-গামা দিয়ে যার সূত্রপাত। ইউরোপে পর্তুগাল থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত যেভাবে ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের নামে, তাকে শোষণ করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতা ধ্বংস করে পোপের কর্তৃত্ব, যা খুব সুন্দরভাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ফুটিয়ে তোলেন 'ফিরিঙ্গি বণিক' গ্রন্থে। সেই সঙ্গে বাদ যায় না আমাদের আত্মকলহ, রাজ্যে রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দু ও বিশ্বাসঘাতকতার দিকটিও। বাদ যায় না কারও কারও বীরত্বের দিকটিও। তবে এটি সত্যি যে এই কাহিনি ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের কল্পগাথা নয়। ইতিহাসকে তিনি সাজিয়েছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে। সেখানে যেমন নিয়েছেন গোলাম হোসেন সালেমী 'রিয়াজ-উস্-সালিন'-এর সাহায্য, তেমনি নিয়েছেন হান্টার, মিল ও নানান পুরাতন নথিপত্রেরও সাহায্য।

ঠিক একইভাবে যুক্তির সাহায্যে অক্ষয়কুমার সাজিয়েছিলেন তাঁর সিরাজদ্দৌলা ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে। কারণ সিরাজদ্দৌলার সঠিক মূল্যায়ন তখনও হয়নি। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে সিরাজের চরিত্র করেছে কলঙ্কলেপন। আর আধুনিক বাঙালিরা তারই 'চর্বিতচর্বণ' করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ম্যালেসন এ ব্যাপারে যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্ভবত ম্যালেসনের ইতিহাস পড়েই অক্ষয়বাবু সিরাজদ্দৌলা চরিত্রটি লিখে ইতিহাসের বিভ্রান্তি ও সিরাজের কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তিনি ম্যালেসনের সাথে যোগাযোগও করেছিলেন। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ম্যালেসন অক্ষয়বাবুকে লেখেন- 'Siraj-Ud Daulah was more unfortu- nate than wicked১৪। অক্ষয়বাবু তাঁর গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ম্যালেসনের নামেই। তিনি দেখিয়েছিলেন সিরাজ শৈশবে তথা তরুণ বয়সে একটু বেশি ভালোবাসায় স্বৈরাচারী, উচ্ছৃঙ্খল হলেও পরিণত বয়সে শান্ত, বিনয়ী ও বেশ সমঝদার হয়ে ওঠেন। শুধুমাত্র আপন লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ও ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞায় সরল বিশ্বাসের জন্য তাঁর এই সর্বনাশ। সিরাজ চরিত্রে দোষের প্রসঙ্গগুলিও অক্ষয়বাবু এড়িয়ে যান নি বরং তা তিনি সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। যেমন সিরাজের বহু পত্নীর সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন আকবরের বহুপত্নীর। তিনি সিরাজের কথা বলতে গিয়ে অনেক কুকীর্তিকে প্রমাণ করিয়ে দেখিয়ে দেন যে তা সম্পূর্ণ রটা কথা। তিনি সিরাজের কুকীর্তির প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় জেমস্ এর কথা বলেন। জেমস্ দুর্নীতিপরায়ণ হয়েও ইতিহাসে ধর্মপরায়ণ আদর্শ রাজা বলে প্রসিদ্ধ। আর সিরাজ সময় থাকতে বীরপ্রতাপে আত্মসংবরণে সফল হয়েও জগতের চোখে, ইতিহাসের চোখে আজও তিরস্কৃত।

সিরাজদ্দৌলার বিচার করতে গিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যে কলঙ্কের কথা তিনি দূর করার চেষ্টা করেন সেটা হল হলওয়েলের 'অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী'। তিনি দেখান প্রাচীন ঐতিহাসিক 'সেয়ার মুতাখেরিন' গ্রন্থ যা গোলাম হোসেন খানের (১৭২৭/২৮-১৭৯৭/৯৮) রচিত সেখানে যেমন নেই এই বর্বরোচিত ঘটনার উল্লেখ তেমনি নেই সেই সময় লর্ড স্পাইডের চিঠিপত্র থেকে শুরু করে কোনো ইংরেজের স্মৃতিচারণে। শুধুমাত্র ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি হলওয়েল তার প্রিয়বন্ধু উইলিয়াম ডেভিসকে যে পত্র লেখেন তাতেই তার উল্লেখ রয়েছে। হলওয়েলও ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ৪ ঠা আগস্ট 'সিলেক্ট কমিটি'র সম্মুখে এই ঘটনার উল্লেখ করেনি। তাছাড়া ওই শহীদদের নামে দেশে কি বিদেশে কোনো স্মৃতিসৌধ রচিত হয়নি। যাও বা হয়েছে তাও ইংরেজরা নিজেই ভেঙে দিয়েছে। আসলে অন্যায়ভাবে সিরাজকে হত্যা নিয়ে ইংল্যান্ডেই কোম্পানির বিরুদ্ধে জনসাধারণ যখন প্রশ্ন তোলে তখন হলওয়েল ঘরের যা বর্ণনা দিয়েছেন (১৮' × ১৮' দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) তাতে এত লোক কোনোমতেই আটত না। অ্যানি বেসন্তও(১৮৪৭-১৯৩৩) তাই মনে করেন। হলওয়েলের মতে অন্ধকূপে আটকে ছিল ১৭০ জন কিন্তু সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৯০। কেউ মৃত, কেউ পলায়ন করে এত সৈন্য থাকারও কথা নয়। এইভাবে অখণ্ড যুক্তি সাজিয়েছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার(১৮৮৮-১৯৮০) অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- ''সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' নামক দুইখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মূল দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে তিনি ইহাদের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং প্রচলিত অনেক ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। বাংলা ভাষায় এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার তিনিই পথ প্রদর্শক।'১৫

অক্ষয়কুমারের এই সময়ের রচনার বৈশিষ্ট্য হল তিনি তাঁর সন্ধিৎসার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজদের দ্বারা বাংলা জয় করার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব কালটিকে। কারণ ইংরেজরা তাতে যেভাবে বাংলা জয়ের বীর গাঁথা প্রমাদপূর্ণ করে তুলেছিল তার কোনো তুলনা হয় না। অক্ষয়বাবু এর সত্যতা সম্পর্কে শুধু প্রশ্নই তোলেননি বছরের পর বছর তিনি যুক্তি, তর্ক, পরীক্ষা, নিরীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের অধ্যয়নের মাধ্যমে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত দেন। তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজকে রমেশচন্দ্র মজুমদার bombshell-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।১৬

তিন

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১) দু'জনের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। দু'জনেই দিকপাল সত্যনিষ্ঠ জ্ঞান ও মননশীল চর্চার। দুজনের প্রকৃতিতে যথেষ্ট মিল থাকায় উভয়ের মধ্যে একসময়ে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।কবিগুরুর সাথে অক্ষয়বাবুর প্রথম পরিচয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজশাহীতে তাঁর বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের বাসায় আসেন ও তাঁর সম্মানার্থে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হলে তিনি

সেখানে 'শিক্ষার হেরফের' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করেন।১৭ এরপর ১৮৯২-৯৪ সময়কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট চারবার রাজশাহীতে আসেন এবং অক্ষয়বাবুর সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে অক্ষয়বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' এর প্রথমাংশ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়বাবুর ঐতিহাসিক যুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন এবং অক্ষয়বাবুর প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাই কোনো এক অ্যাংলোইন্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় তাঁর জবাব দেন এবং অক্ষয়কুমারকে তিনি 'যুগপ্রবর্তক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পরে তিনি আরও বলেন- ‘প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতাম।... এমন অবস্থায় আমাদের দেশের যে কোন কৃতী গুনী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন। তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র।... বাঙ্গালা ইতিহাসে অক্ষয়কুমার বাবু যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন, সে জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।’১৮

অক্ষয়কুমার ঐতিহাসিক সত্যকে এত গভীরভাবে ভালোবেসে ছিলেন যে তার বিকৃতি দেখলে তিনি তীব্র প্রখর ভাষায় তার প্রতিবাদ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তা সে ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রেই হোক বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেই; তাঁর সমালোচনা থেকে বাদ যায়নি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), তথা বঙ্কিমচন্দ্রও। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) কাব্যগ্রন্থে ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের বিচ্যুতি লক্ষ করে অক্ষয়বাবু সত্যের খাতিরে তীব্র মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ফলে তৎকালীন সাহিত্য সমাজে বেশ একটা হৈ চৈ বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল।১৯ সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়বাবুর প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা রেখে দুটি বিষয়ের মধ্যে আপোসের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ইতিহাসের রসটুকুর প্রতি সাহিত্যের লোভ সত্যের প্রতি ততটা নয়।২০ কিন্তু অক্ষয়বাবু তাও জোরের সাথে বলেন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক যেই হোক না কেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চরিত্র কোনো কারণে অদল বদল করার অধিকার কারও নাই।২১ পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে 'ইতিহাস-রস' নামে একটি রসের সৃষ্টি করে স্কটের 'আইভান হো' উপন্যাসের উদাহরণ দিয়ে বলেন ইতিহাসের রসটুকুতে ঔপন্যাসিকের লোভ, তার সত্য মিথ্যার দায় ঔপন্যাসিকের নেই। কিন্তু তাও অক্ষয়বাবুকে টলানো যায়নি। 'রস'-এর চেয়ে 'সত্য' বড় এই ছিল তাঁর অভিমত। শেষ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকা ছাপাতে বাধ্য হয়- সত্যের শাসন অতি কঠোর-বঙ্কিমের মৃত আত্মার প্রতি আমাদের ইহা ছাড়া আর কিছু বক্তব্য নেই।২২

সাহিত্যে ইতিহাসের ব্যাপারে অক্ষয়বাবু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে মতান্তর দেখা দিলেও তা মনান্তর পর্যন্ত যায়নি। আর রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহাসিক সত্যের ক্ষেত্রে অক্ষয়বাবুর কাছে কতটা নির্ভরশীল ছিলেন তার উদাহরণ পাওয়া যায় বঙ্কিম বিতন্ডার পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থ অক্ষয়কুমারকে পাঠিয়েছিলেন 'রিভিউ' করবার জন্য কারণ

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যটি ছিল ইতিহাসাশ্রিত। এই 'রিভিউ' করতে গিয়ে অক্ষয়কুমার শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে জানিয়েছেন- ‘স্বদেশের ইতিহাস হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেবরে কবিতা নিবদ্ধ করিলেও যে সৌন্দর্য সৃষ্টির বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কবি বঙ্গ-সাহিত্য সেবকগণের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।’২৩ 'কথা' ছাড়া 'কণিকা' কাব্যেরও রিভিউ করেছিলেন অক্ষয়বাবু।

এরপর অক্ষয়বাবু বাংলার ইতিহাসচর্চাকে উৎসাহিত করার জন্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছাপানোর কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করেন। ‘ভারতী’ পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন ও সম্পাদকীয় কবিগুরু নিজেই করে দেন। 'সূচনা'তে কবিগুরু নিজেই বলেন- ‘অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতির আশ্বাসে নহে। ... পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।’২৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্গদর্শনে'র সাথেও এই পত্রিকার সাদৃশ্যতা দিয়েছিলেন নতুনভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগানোর জন্য। বিভিন্ন বিষয় এতে উত্থাপন করা হয় নতুন নতুন লেখক লেখিকাদের মাধ্যমে, যেমন 'ইণ্ডিকা'- শ্রী ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, 'ঐতিহাসিক কবিতা সংগ্রহ' শ্রী প্রসন্ননারায়ন চৌধুরী প্রভৃতি। সম্পাদকের নিবেদনে অক্ষয়বাবু বলেন- ‘আমাদের ইতিহাস নাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাস সংকলনের উপকরণেরও অভাব নাই।... তাহা বহুজনসাপেক্ষ বহু ব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার, কিন্তু যাঁহারা ললাটকলঙ্ক অপসারিত করিয়া সভ্যসমাজে মানব পদবীতে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ব্যাকুলতা যদি আন্তরিক হয়, তবে এই কঠিন ব্যাপার একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।’২৫ কিন্তু পত্রিকাটি তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

এই ভাবে নানা বিষয়, ঘটনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। এককালে বাংলার সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাব সুদূর দ্বীপোপদ্বীপ (যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি অঞ্চলে) ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ে অক্ষরবাবু 'সাগরিকা' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৩১৯ সনে 'সাহিত্য' পত্রিকায়। ঠিক একই বিষয়বস্তুর উপর একই শিরোনামে ১৩৩৪ সনে কবিগুরুও একটি চমৎকার কবিতা লেখেন। কঠোর হলেও একথা সত্য অধুনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃহত্তর বাংলায় যতটা চর্চিত অক্ষয়বাবু ঠিক ততটাই অবহেলিত অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই অক্ষয়বাবুকে তাঁর যুগের শীর্ষস্থানীয় বাঙালি ঐতিহাসিকের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

চার

'বাংলার ইতিহাস নাই' কথাটি বলেন অনেকেই কিন্তু কথায় না আটকে থেকে কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন একমাত্র অক্ষয়কুমারই। ১৯১০ সালে শরৎকুমার রায় (সভাপতি), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (পরিচালক) ও রমাপ্রসাদ চন্দ (অবৈতনিক সম্পাদক) এই তিনজনে মিলে 'বরেন্দ্র অনুশীলন সমিতি' গঠন করেন। উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার ইতিহাস ও পুরাকীর্তির উদ্ধারের জন্য এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রথম উপলব্ধি করেন। ওঁনার সুযোগ্য পরিচালনাধীনে ১৯১৯ সালে এই সমিতি 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে' রূপান্তরিত হয়। এই সমিতির কাজ ছিল মূলত তিন প্রকার-সংগ্রহ, গবেষণা এবং প্রকাশনা। পরিচালক হয়ে এই তিনটি কাজেই অক্ষয়বাবু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন প্রাচীন পুঁথি, উপকথা, কিংবদন্তী প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি পৌন্ডবর্ধন, বরেন্দ্র, গৌড় প্রভৃতি সারা বাংলার ইতিহাস খোঁজবার চেষ্টা করেন। এপ্রিল ১৯১০ সালে অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ চন্দ ও শরৎকুমার উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি সংগ্রহের সফর শুরু করেন। গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ে অক্ষয়কুমার মোট আটখণ্ডে বাংলা ভাষায় বাংলার একটি ইতিহাস রচনার কল্পনা করেছিলেন। তার মধ্যে বাদ ছিল না কিছুই, ইতিহাস, শিল্প, স্থান বিবরণ, জাতিতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব থেকে শুরু করে সবই। ১৯৬৫ সালে জলপাইগুড়ি জেলার শ্রী নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের "অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়ামে" তার নিদর্শন এখনও কিছু সঞ্চিত করে রাখা আছে। অক্ষয়বাবু আটখণ্ডে বাংলার ইতিহাস শেষ করতে পারেন নি কিন্তু তার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা পাই রমাপ্রসাদ চন্দের(১৮৭৩-১৯৪২) 'গৌড়রাজমালা' (১ জুন ১৯১২), অক্ষয়বাবুর প্রণীত 'গৌড়লেখমালা' (১ সেপ্টেম্বর ১৯১২) এবং শ্রী গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সঙ্কলিত 'তারাতশ্রম্' (১৯১৪) গ্রন্থগুলো।

অক্ষয়বাবু তাঁর 'গৌড়লেখমালা'য় বরেন্দ্র খনন কার্য-র যে বর্ণনা দেন তা যেমন সরস তেমনি ঐতিহাসিক। এতে শিক্ষার বিষয়ও ছিল যেমন খননকার্য কিভাবে করতে হয়, কিভাবে মূর্তি চিনতে হয় প্রভৃতি। পরবর্তী প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের কাছে এই ছিল তাঁর দান। ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে সমন্বয় কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যালেড কার (১৮৯২-১৯৮২) তাঁর গ্রন্থ 'কাকে বলে ইতিহাস'-এ লেখেন-'ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ আর তথ্যগুলো অতীতের। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য দু' এরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অমূল্য ও ব্যর্থ; ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। অতএব 'কাকে বলে ইতিহাস'-এ প্রশ্নে আমার প্রথম উত্তর ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এটি এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।২৬

অক্ষয়বাবু তো তাই করেন। তিনি অতীতের ভুলগুলি তথ্যের মাধ্যমে যথাসম্ভব শুধরে পেশ করেন আমাদের কাছে। বিজ্ঞানের মত যুক্তি, তর্ক, কার্যকরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসে। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যালেড কার যেমন বলেন- 'ইতিহাসকে বিজ্ঞান রূপে

দেখার দাবিদার ছিলেন প্রত্যক্ষবাদীরা। প্রত্যক্ষবাদীরা বললেন: প্রথম কাজ, তথ্য নির্ণয় করো, তারপর তার থেকে সিদ্ধান্তে এসো।’২৭ অক্ষয়বাবুরও পদ্ধতি এইরূপ। তিনি মনে করতেন 'বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা' এভাবে তিনি তার কর্মের মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসচেতনাকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করে তোলেন।

পাঁচ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শুধু ইতিহাস চেতনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, তিনি রাজশাহীতে 'রেশম শিল্প বিদ্যালয়' ও চালু করেন। এতে অক্ষয়বাবু বেশ সফলতাও পান। অস্ট্রেলিয়া থেকে এখানে মটকা কাপড়ের অর্ডার এসেছিল।২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাতে উৎসাহিত হয়ে নিজ জমিদারিতে রেশমচাষ শুরু করেন, তবে ব্যর্থ হন। পরে ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে বয়ন বিদ্যালয়টি চালু করেন। তাছাড়া অক্ষয়বাবু ১৮৯৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার 'ডায়মন্ড জুবলী' অনুষ্ঠান উদ্যাপন উপলক্ষ্যে 'শকুন্তলা নাট্য সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন (যা পরে হয় 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার পার্টি')। সেখানে 'শকুন্তলা' ও 'বেণীসংহার' নামক সংস্কৃত নাটক সফল ভাবে মঞ্চস্থ করেন অক্ষয়বাবু। সেই নাটক দেখে ১৮৯৯ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার উডবার্ণ প্রীতি লাভ করেন।২৯ অক্ষয়বাবু নিজে 'বাসবদত্তা' 'আবাহন' 'আশা' নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু তা কোথাও মুদ্রিত হয়নি। তাই শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার বলেন-'আশা' ও 'আবাহন' মুদ্রিত হইলে নাট্যজগতে সমাদর লাভ করিতে পারিত।৩০ এর সাথে তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাগ্মী, সুদক্ষ ক্রিকেটার, নাট্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী প্রভৃতি।

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

নিজের জীবনে তিনি প্রচুর সম্মান পান যেমন ১৯০৪ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯১৫ সালে রাজ সরকার তাঁকে 'কায়সার-ই-হিন্দ' সুবর্ণ পদকে ভূষিত করেন। ১৯২০ তে পান তিনি সি. আই. ই. উপাধি প্রভৃতি। মৃত্যুর আগে তিনি বাংলার দিকপাল শিল্পী ধীমান ও বীতপালের ভাস্কর্যরীতির সম্পর্কে একটি কাজে হাত দিয়েছিলেন। এই খবর শুনে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালপ্রয়াণে কাজটি তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন কি না তা জানা যায় না।৩১

ছয়

এহেন ব্যক্তিত্ব ছিল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র। বাংলার এবং বাঙালির ইতিহাসের নতুন নতুন পন্থা উন্মোচনে তিনি সবসময় ছিলেন ব্যস্ত। একই সঙ্গে হাজার ঝড়-ঝাপটা, ক্লান্তি উপেক্ষা করে তিনি গৌড়, বরেন্দ্র প্রভৃতি স্থানের নিজস্ব ইতিহাস উদ্ধার করেন। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল এই যে, ইতিহাস বিদ্যার অন্তর্গত এমন

কোনো বিষয় ছিল না, যা সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লেখেননি। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, প্রতিমাতত্ত্ব সব বিষয়েই তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্যি যে অধুনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হয়তো তাঁর নামই জানেন না। আজও ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ চলে যেমন 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', 'পলাশীর পরে বাংলা' প্রভৃতি। কিন্তু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মত প্রত্যক্ষ ধর্মী কাজ কোথায়? বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব আজ হয়তো বোকাবাক্স ও কম্পিউটারের মাধ্যমে হাতের মুঠোয় কিন্তু আমরা জানিনা আমাদের দেওপাড়া'র নাম। তাই অক্ষয়বাবু বলেন- ‘আমরা বরং মেরুমণ্ডলের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার উপর প্রত্যেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণপথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি; দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, কোথায় কাহার প্রকৃত অবস্থান, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান দিতে পারিনা! আমাদের সাহিত্যে "দেওপাড়া"র নাম একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়; কিন্তু "দেওপাড়া” কোথায়, তাহার আসে-পাশে কি ছিল, এখনই বা কি আছে, যাহার কথা আমাদের সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই।... আমরা সন্ধান লই নাই বলিয়া আমাদের কাছে আমাদের দেশ এরূপ অপরিচিত।’৩২ অক্ষয়বাবু কাজটি শুরু করলেও তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে উৎসাহটিও হারিয়ে যায়। তাই আজও কি প্রয়োজন নয় অক্ষয়বাবুর আদর্শের। যে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তির পুনরুদ্ধারের জন্য অক্ষয়বাবু ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, আজ সেখানে কোচবিহারের গোসানিবাড়ির ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি কবে থেকে তার ইতিহাস নিয়ে বসে আছে। কিন্তু তার ইতিহাস আজও অজানা। অক্ষয়কুমারের আদর্শ বেঁচে থাকলে বাংলার ইতিহাস হয়তো অন্য বয়ানে লেখা হত। আমাদের শিল্প, আমাদের কারুকার্য তার ভাস্কর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষের উন্মাদনায় আমরা যেমন ভুলে যাই একই বৎসরে প্রকাশ পেয়েছিল আমাদের বাংলার আধুনিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১ খ্রি.) ঠিক তেমনি ভাবে ভুলে যাই একই বৎসরে জন্মলাভ করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এমনকি যিনি ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে স্কুলপাঠ্য লিখতে অস্বীকার করেছিলেন সেই স্কুলপাঠ্যে সিরাজের প্রশ্নোত্তরে আজ তিনিই ব্রাত্য হয়ে গেছেন। তাই আজকের যুগে আবার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পুনরধ্যয়ন করা প্রয়োজন। অন্তত স্বাধীনভাবে আমাদের সঠিক বাঙালি ঐতিহাসিক পরিচয় গর্বের সাথে, প্রামাণ্য জোড়ে দেবার জন্যে, কারণ- ‘ইউরোপের কোন কোন স্থান কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে এবং ভূগর্ভে নিহিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত করিবার জন্য এখনও লোকে কত আয়েস স্বীকার করিয়া থাকে, আমাদিগের আবাস স্থলের নিকটে যে সকল পুরাতন গ্রাম নগর বিজন বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি তাহার জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।’৩৩
সেই আগ্রহের জন্য তাই এক শতার্ধ পরে আজও প্রয়োজন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র আদর্শ জীবন ও কর্ম।

অক্ষয় তথ্যের উৎস-সন্ধানে

১। 'কাজী নজরুল ইসলাম ও অক্ষয়কুমার', ফজলুল হক, মূলগ্রন্থ, “ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জীবন ও কর্ম”, মুক্তধারা, মাঘ ১৩৯৭, পৃ. ১৩৩।

২। 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”, ৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৩, পৃ. ১২।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-৬।
৪। ঐ. পৃষ্ঠা-৮।
৫। “গ্রাম বাংলার ইতিকথা”, ডাবলিউ, ডাবলিউ, হান্টার প্রণীত, ভাষান্তর – অসীম চট্টোপাধ্যায়, সুবর্ণরেখা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ-৬।
৬। 'উপক্রমণিকা', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মূলগ্রন্থ- “গৌড়রাজমালা”, রমাপ্রসাদ চন্দ, ১৩১৯, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।
৭। “আচার্য যদুনাথ: জীবন ও সাধনা”, মণি বাগচী, জিজ্ঞাসা, ১৩৮২, পৃ. ৭৩।
৮। “ভারতী”, বৈশাখ ১৩০৫, পৃ. ৮১-৮৬।
৯। 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', সম্পা- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,“সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫।
১০। “বাংলার ইতিহাস (২য় খণ্ড)”, যদুনাথ সরকার, প্রকাশকাল: ১৯৪৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার ইতিহাস প্রকাশন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত, পৃ. ৪৬-৬৯।
১১। 'উপক্রমণিকা', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মূলগ্রন্থ- “গৌড়রাজমালা”, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।
১২। “বাংলার ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়”, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, “ভারতবর্ষ” মাঘ ১৩৪৪, পৃ. ২৮০।
১৩। 'অবতরণিকা', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মূলগ্রন্থ- “সিরাজদ্দৌলা”, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, মাঘ ১৩০৪।
১৪। “ভারতকোষ”, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১, পৃ. ৬।
১৫। Foreword, Dr. R. C. Majumdar, Monograph No.-7, Varendra Research Museum, Rajshai.
১৬। “রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা”, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ২৭৮।
১৭। “ভারতী”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রাবণ ১৩০৫, পৃ. ৩৭১।
১৮। ‘স্মৃতির পূজা’, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, “ভারতবর্ষ”, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ. ৯৮৯।
১৯। 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ভারতী”, শ্রাবণ ১৩০৫, পৃ. ৩৭৮।
২০। 'স্মৃতির পূজা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮৯।
২১। “ভারতী”, সম্পা- হিরন্ময়ী দেবী ও সারদাদেবী, বৈশাখ ১৩০৪, পৃ. ৪১-৪২।
২২। 'রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যের সমালোচনা', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, “প্রদীপ”, ভাদ্র ১৩০৮, পৃ. ৩৫১-৩৫২।
২৩। ‘ঐতিহাসিক চিত্র সূচনা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “রবীন্দ্ররচিত ভূমিকা”, সংকলন ও সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, বিশ্বভারতী, ২০০২, পৃ. ১৪৩।
২৪। “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।
২৫। 'ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্য', ই এইচ কার, ভাষান্তর- স্নেহোৎপল দত্ত, সৌমিত্র পালিত, মূলগ্রন্থ-“কাকে বলে ইতিহাস”, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৬, পৃ. ২১।

২৬। ঐ, পৃ. ৩।
২৭। “ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জীবন ও কর্ম”, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।
২৮। ঐ, পৃ. ৮৯।
২৯। 'আচার্য্য অক্ষয়কুমারের স্মৃতিপূজা', ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, “প্রবাসী”, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৮২৫।
৩০। “অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়”, ফজলুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৯।
৩১। “উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ”, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সম্পা-আনন্দগোপাল ঘোষ ও মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, রত্না প্রকাশন, ২৯ শে ভাদ্র ১৩৯১, পৃ. ৩৬।
৩২। ঐ, পৃ. ২-৩।
৩৩। ঐ, পৃ-৩।

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

আধুনিকতার উন্নতি নাকি অবলুপ্তি

পায়েল সাহা
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
স্নাতকোত্তররত (তৃতীয় অর্ধবর্ষ), কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকের শেষের দিকে ম্যানুয়েল গুটিয়েরেজ নাজেরা এবং হোসে মার্টির রচনায় আধুনিকতার উদ্ভব হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে, আধুনিকতা হলো, একটি আচরণ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজে একটি নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, আখ্যান বা মহা আখ্যান প্রতিষ্ঠিত হয় যাকে নিয়মগতভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়। যা আমাদের নতুন পথের দিশারী, চিন্তার শক্তি আরও দৃঢ় করে তোলে।

বর্তমানে আমরা সকলের মুখে আধুনিকতার জয় গান শুনি। কিন্তু কি এই আধুনিকতা? আদৌ আমরা আধুনিকতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছি? হয়তো কেউ পেরেছে, হয়তো কেউ পারেনি।
যদি আধুনিকতার প্রকৃত বিচার আমরা করতে চাই, তবে আলোচনা করতে হবে প্রযুক্তিকে নিয়ে। যার দ্বারা আমরা প্রতি নিয়ত আধুনিকতার সাথে যুক্ত হচ্ছি। এই আধুনিকতা আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত জড়িয়ে আছে কখনো সামাজিক ভাবে, কখনো রাজনৈতিক ভাবে আবার কখনো রাষ্ট্রীয় কারণে।
আধুনিকতা হল যা যুক্তি তর্ক প্রমাণ সাপেক্ষে বিচার করা হয়; যেখানে কোন মিথ্যের আশ্রয় নেই।

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

আমরা প্রতিনিয়ত আধুনিক হয়ে উঠছি ঠিকই, কিন্তু তার পাশাপাশি কিছু কিছু মূল্যবান মুহূর্তও হারিয়ে ফেলছি, আধুনিকতার জালে।
আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি, তাই আমাদের শৈশব ছিল অন্যরকম। আমরা সকলের সাথে কথা বলতাম, একসাথে বিকালবেলা মাঠে খেলাধুলা করতাম, এতে যেমন শরীর চর্চা হত ঠিক তেমনি মনের আনন্দও খুঁজে পেতাম। আমাদের ছেলেবেলাগুলো গল্পের বইতে কেটেছে, রান্না-বাটি খেলায় কেটেছে, টিফিন ভাগ করে কেটেছে।
ঠিক তেমনি সামাজিকগত দিক থেকে পূর্বে দেখা যেত সকলে যৌথ পরিবারে বাস করত, একসাথে হই হই করত সকলের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিত। তবে এখন এসব আর দেখা যায় না।
পূর্বে ডিপ্রেশন বা মনস্তত্ত্ব ঘটিত কোন রোগের কথা ছাত্র জীবনে কমই শোনা যেত।
আর এখন! কারণ আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।
এখনকার শিশুরা খেলাধুলা কি জিনিস জানে না, রান্না-বাটি খেলা, মাঠে বিকেল বেলা খেলতে যাওয়া জানেনা। কারণ আধুনিকতা তাদেরকে এই সমস্ত আবেগ থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। এখন তারা ঘরে বসেই মোবাইল ফোন দেখে। খেলতে হলে মোবাইলে গেম খেলে

কারো সাথে কথা বলে না, কারো সাথে মিশতেও চায় না, তাই তাদের মধ্যে বেড়েছে একাকিত্ব। তারা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে, ঘুমোতে স্লিপিং পিলস্ লাগছে।

তবে এই কি আধুনিকতা? যা আমাদের প্রতিনিয়ত একাকিত্বে জালে জড়িয়ে ফেলছে!
এখন আর যৌথ পরিবার দেখা যায় না। কারণ বাবা-মা'কে সময় দেওয়াটা কেমন যেন খামখেয়ালিপনা। প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে সম্পর্কে দূরত্ব বাড়ছে, বন্ধুত্বের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। অথচ আধুনিকতা এসে আমাদের জীবন পাল্টে দিয়েছে, তাই আমরা এখন দূরদেশের মানুষের সাথে যখন তখন যোগাযোগ করতে পারি, চাইলে তাদের দেখতেও পারি।
ফেসবুকে অনেক বন্ধু থাকে কিন্তু অসুস্থ হলে কিংবা বিপদে পড়লে ফেসবুকে সেই বন্ধু কখনই পাশে এসে দাঁড়ায় না। আধুনিকতা ঠিক যেদিন থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে তবে থেকেই অপরাধের প্রবণতা বেড়েছে। তাইতো আধুনিকতার সাথে সাথে 'সাইবার ক্রাইম' বলেও নতুন একটি শব্দ আমাদের জীবনে চলে এসেছে। আধুনিকতাই হয়তো এই শব্দটিকে আমাদের মাঝখানে এনেছে। অথচ আমরা আধুনিক। আধুনিকতা দিনদিন বাড়ছে বলে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যাও হয়তো বাড়ছে।
ইটকাঠ পাথরে গড়া পরিবেশে আর স্নিগ্ধতা নেই, খোলা বাতাস নেই, কারণ আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

প্রকৃতপক্ষে, আধুনিকতা আমাদের মনে যেভাবে লেগেছে, তার অপব্যবহার করছি। আধুনিকতার প্রয়োজন ভীষণ— দেশ, সমাজ রাজনীতি, অর্থনীতিতে। কিন্তু তাই বলে প্রযুক্তির জালে এমনভাবে আটকে যাওয়া ঠিক নয় যে আমরা আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলবো। সর্বোপরি নিজেকে হারিয়ে ফেলবো।

আধুনিকতা প্রযুক্তি, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান এবং মতাদর্শ সহ জীবনের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে ঠিকই কিন্তু তার সঠিক ব্যবহারও আমাদের জানতে হবে, দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে সময় সাপেক্ষে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ তবে আমাদের আবেগ গুলো যেন অবলুপ্তি না পায়। আমাদের যেন একা না করে তোলে, আমাদের যেন হিংস্র না করে তোলে। তবেই আধুনিকতা উন্নতির সোপান হয়ে উঠবে। নয়তো আধুনিকতা প্রতিনিয়ত আমাদের যন্ত্রণা, বেদনা অপরাধে আমাদের মনুষ্যত্ববোধকে অবলুপ্ত করে দিবে।

আধুনিক সমাজে জল সংরক্ষণ

শ্রীময়ী সাহা
স্নাতকরত (চতুর্থ অর্ধবর্ষ), বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

সময়ের সাথে চলতে চলতে সাধারণ মানুষ এখন আধুনিক সমাজে এতটাই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে যে সেটা আর বলার কথা রাখে না ।
আধুনিক সমাজে মানুষ সবদিকে খেয়াল রাখলেও জলের ব্যবহার তারা ঠিক করে করছে না। জল মানে জীবন এই কথাটি ছোটো বড়ো সবাই জানে,কিন্তু এই জীবনের ঠিকঠাক মূল্য কেউই দিতে পারছে না।জলের ব্যবহার ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে তা বলা মুশকিল।কিন্তু আজ থেকে কয়েক বছর আগেও জলের এত অপচয় এবং জলের এত সংকট দেখা যেত না ।

প্রাচীন কালে যখন বৃষ্টি হতো তখন সেকালের মানুষেরা খেয়াল রাখতো যাতে জল মাটির ভেতরে কিছুটা চলে যায় আর কিছুটা মাটির উপর দিয়ে বয়ে বিভিন্ন নদ-নদী, সাগরে গিয়ে মেশে। সেই প্রাচীন কালের মানুষেরা যখন সেচের জন্য নদীর জল আনার জন্য নালা বা পুকুর তৈরি করতো তখন তারা দেখতো মাটি কিছুদূর খনন করলে সেখান থেকে জল বের হয় । বলাইবাহুল্য যে এইভাবেই ভূগর্ভস্থ জলের আবিষ্কার হয়েছে ।

আমাদের সাধারণ জীবন-যাপনে জল কতটা গুরুত্বপুর্ণ তা সবাই জানি। জল ছাড়া আমরা কেউই বাঁচতে পারবো না। তারপরেও জলের অপচয় রোধ করা যাচ্ছে না। জল অপচয়ের বিভিন্ন কারণ গুলি—

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

১. বাড়ির যেকোনো কাজ কর্ম, যেমন— স্নান, কাপড় কাচা, রান্না করার সময় অহেতুক জলের কল খুলে রেখে জলের অপচয়।

২. যেকোনো পুকুর-জলাশয় গুলোতে নোংরা-আবর্জনা ফেলে, আবার কখনো গরু-মোষ স্নান করিয়ে জল দূষণ করা।

৩.আজও দেখা যায় গ্রামে-গঞ্জে আবার শহরের রাস্তার ধারেও পাইপলাইনের কল গুলো থেকে অনবরত জল পড়ে যাচ্ছে, এভাবেই জল অপচয় হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন ।

এই জল অপচয়ের কারণে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জলের সংকট দেখা দিচ্ছে। কম বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে রাজস্থান, গুজরাট সহ পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে জলের অভাব দেখা যাচ্ছে।

চেন্নাই মেট্রোপলিটন এলাকা (CMA) চেন্নাই শহর নিয়ে গঠিত ; যার জনসংখ্যা ৪.৯ মিলিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলির একটি আনুমানিক জনসংখ্যা ৮.৬ মিলিয়ন ও এটি

ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম শহর। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চেন্নাইতে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তা সাধারণ মানুষের জনজীবন কার্যত ধ্বংস করে দিয়েছিল। বন্যার (২০১৫-২০১৬) সময় যে জলাধারগুলি উপচে পড়েছিল,সেগুলি শুকিয়ে গেছে। চেন্নাইয়ের মোট জলের প্রয়োজন ৮৩০ MLD (মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন) তার মধ্যে, চেন্নাই মেট্রোপলিটন ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড (CMWSSB) সংকটের সবচেয়ে খারাপ দিনগুলিতে প্রায় ৫২৫ MLD জলই সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল ।

আবার ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে যেমন-কর্ণাটক,তামিলনাড়ু,অন্ধপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার প্রধান জলাধারগুলিতে, উল্লেখযোগ্য ভাবে নিম্ন জলস্তরের কারনে গুরতর জল সংকট দেখা দিচ্ছে। কর্নাটকের তুঙ্গভদ্র এবং অন্ধপ্রদেশ তেলেঙ্গানা সীমান্তের নাগার্জুন সাগরের মতো উল্লেখযোগ্য বাঁধগুলিতে জল মাত্র ৫% ভরাট হয়েছে। অন্যদিকে এল্ নিনোর প্রভাবে কম বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলগুলিতে জল সংকট দেখা দিচ্ছে। নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন ডিহাইড্রেশন, সংক্রমণ'র ফলে মানুষ মারা যাচ্ছে। NITI Aayog'র একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ২লক্ষ মানুষ অপর্যাপ্ত জল সরবরাহের কারণে মারা যায়। ভারতে জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার ১৮%, কিন্তু মাত্র ৪% মানুষের জন্য পর্যাপ্ত জল সম্পদ রয়েছে। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে প্রায় ৯১ মিলিয়ন ভারতবাসী নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে ভুগবেন বলে জানা যাচ্ছে।

জল অপচয় এবং জল সংকটকে বাঁচাতে আমাদের জল সংরক্ষণ করা উচিৎ।সাধারণ মানুষ যেন আর জলকষ্টে না ভোগেন সেদিকে আমাদেরই খেয়াল রাখতে হবে। ভারত সরকারের জল শক্তি মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে 'জলশক্তি অভিযান' চালু করেছিলো। এটি হল সমগ্র দেশে বিস্তৃত জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি প্রচারাভিযান; যার লক্ষ্য ছিল দেশের নাগরিকদের জল সংরক্ষণের বিষয়ে উৎসাহিত করা। এই জল সংরক্ষণ প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল দুটি পর্যায়ে, ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ এবং দ্বিতীয়টি ১লা অক্টোবর ২০১৯ থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০১৯। আমরা জানি ২২ মার্চ "বিশ্ব জল দিবস" সেই দিনটিকে মাথায় রেখে ২০২১সালের ৩০শে নভেম্বর ভারত সরকার জলশক্তি অভিযান "ক্যাচ দি রেন"(JSA:CTR) চালু করেছিল।

জলকে কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে সেই বিষয়টি বিহারের নালন্দা জেলায় শুরু হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল ধারক জলাধার নির্মাণ করা। আমরা চাইলে নিজেরাই জল সংরক্ষণ করতে পারি যেমন বৃষ্টির জল; বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হল প্রাকৃতিক জল সংরক্ষণ এবং মাটির নীচের জলস্তর পুনঃ সংস্থাপিত করার একটি কার্যকরী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয় এবং একটি গর্ত অথবা জলাধারে চুইয়ে যেতে দেওয়া হয়। যাতে সেটি মাটির নীচে প্রবেশ করতে পারে এবং মাটির নীচের জলস্তরের উন্নতি ঘটাতে পারে।আবার জলের চাপ তৈরি করার ভালভ পদ্ধতি ব্যবহার করেও জল সংরক্ষণ করতে পারি এবং জল অপচয় রোধ করতে পারি। জলের চাপ কম করার

একটি প্রাথমিক পদ্ধতি হলো হাইড্রোলিক সিস্টেম যা জলের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ব্যবহার যোগ্য জল কতটুকু এবং কোন স্পিডে ব্যবহার করবো তা নির্ধারণ করবে । এর মাধ্যমে আমরা জল সংরক্ষণ করতে পারি।

তালাব বা বাঁধি– এই প্রকার পুকুর গুলি প্রাকৃতিক অথবা মানুষের দ্বারা তৈরী করা যেতে পারে। পাঁচ বিঘার কম স্থান জুড়ে বিস্তৃত থাকা একটি জলাশয় তালাব নামে পরিচিত এবং যেখানে একটি মাঝারি মাপের হ্রদ তৈরি হয় তাকে বাঁধি বলে ।আর নানা রকম পদ্ধতি আছে যেমন - ঝালরা, কুণ্ড, তানকা, নাদি,বাঁশের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা,কুলহ, জ্যাকওয়েল।

আমরা নিজেরাই চাইলে জল সংরক্ষণ করতে পারি। বাড়ির কাজ হোক বা জলাশয় পরিষ্কার রেখে। জল পরিমাণ মতো ব্যবহার করে,অহেতুক জল নষ্ট না করে। নাহলে ভবিষ্যতে জলকষ্ট আরো বাড়তে চলেছে তখন জল না পেয়ে আরো হাহাকার বেড়ে যাবে আমাদের এই আধুনিক সমাজে দাঁড়িয়েও। আমরা সবাই নিজেদের কাছে নিজেরাই প্রতিজ্ঞা করি যে জলকে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের মতোই মূল্য দেব ।

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

শিক্ষিত করুন : এডুকেশন ম্যাটার্স

ধৃতিমান চৌধুরী
স্নাতকরত (ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ), বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

"শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে থাকা উৎকর্ষের প্রকাশ।"
—স্বামী বিবেকানন্দ।।

শিক্ষা যা মানুষই অর্জন করতে পারে, যা শুধুই মানুষের তবে তা কল্যাণ সাধন করতে পারে গোটা ব্রহ্মাণ্ডের। এই শিক্ষা কোনো পৃথক মনুষ্যজাত উপলব্ধি নয় এটি ঈশ্বর প্রদত্ত এক চেতনা যাকে নিজ গুণে সকলের সম্মুখে নিয়ে আসতে হয়। এই শিক্ষা বিষয়টা আমার আপনার স্থূল চক্ষুতে ধরা দেয় না তা একমাত্র ধরা দেয় আমাদের উপলব্ধিতেই। আর গোটা জগতটাই যেখানে শুধুই মায়া যা শুধুই উপলব্ধির সেখানে শিক্ষা যে কি ভয়ানক গুরুত্বপুর্ণ সেটা আশা করি বলার অবকাশ রাখে না। তাহলে এতক্ষণে এতটুকু তো বোঝাই গেলো যে শিক্ষিত হতে গেলে কাউকেই সুপার হিউম্যান হবার আবশ্যকতা নেই প্রয়োজন শুধুই হিউম্যান হবার।

আর আমরা মানুষেরা সমাজবদ্ধ জীব তাই এই সমাজ নামক সংগঠনকে পরিচালনা করতে গেলে কিছু সুস্থ্য স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলা উচিৎ আর নিয়ম গুলিই হলো আমাদের নৈতিকতা। নীতি আমাদের কোনো সময় ছেড়ে দিলেও নীতিকে যেন আমরা কখনই না ছাড়ি। এতে সমাজ জুড়ে নৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া অতিরিক্ত কিছুই হবে না, কিন্তু এতেই ভেঙে পড়বে আমাদের সমাজ নামক সংগঠন। এখন আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন কি ধরনের পড়াশোনার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে শিক্ষিত করবো? কত দূর পড়াশোনা করলেই বা আমাদের শিক্ষিত হয়ে ওঠা সম্পন্ন হবে? কিংবা কার কাছ থেকে পড়াশোনা করলেই শিক্ষিত হিসেবে পরিগণিত হওয়া সম্ভব? আসুন একে একে উত্তর গুলো দেওয়ার চেষ্টা করি।
দেখুন পড়াশোনা হলো এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা নামক চেতনাকে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারি। এই শিক্ষাকে যে প্রতীচী কায়দার পুঁথি সর্বস্ব পড়াশোনাই হতে হবে কিংবা প্রাচ্য কায়দার পড়াশোনা হতে হবে সেটা ঠিক নয়। সে আপনি আপনার পারিবারিক কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করুন তাতেও অসুবিধা নেই তবে নৈতিকতার শিক্ষাটুকু নিয়ে একজন বাস্তব চিন্তাশীল প্রগতিশীল নিরপেক্ষ বিচারবোধ সম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠলেই হবে। তবে হ্যাঁ সারা বিশ্ব ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সত্যতাকেও তো উপেক্ষা করা যায় না, তাই সকলকেই অন্তত মন প্রাণ দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি পড়াশোনা টা করা উচিৎ এর নীচে তো নয়ই। আর এবারে যদি বলি কার কাছ থেকে আমরা এই নীতি শিক্ষা লাভ করতে পারি, তারা হলেন আমাদের গুরুজন স্থানীয় প্রণম্য ব্যক্তিবর্গ। সে আমাদের কোনো একজন শিক্ষক যেমন হতে পারেন আবার তেমনই হতে পারেন মা-বাবা। তবে হ্যাঁ তাকেও হতে হওয়া চাই নীতিবান, কোনো নীতিহীন ব্যক্তির থেকে নৈতিক শিক্ষা নিতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

সে যাই হোক প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের প্রকৃত শিক্ষিত হবার প্রয়োজন টা কোথায়? আছিই তো বেশ হেসে-খেলে-কেঁদে, জীবন কাঁটিয়ে দিচ্ছি। কেউ অধিকার কেড়ে নিয়ে আমায় মাত্র দুটো রুটির টাকা গুঁজে দিলেও তো 'অধিকার ফেরৎ চাই' বলে হাঁক-ডাক করছি না। তাহলে প্রয়োজনটা কোথায় তাই না!?— ঠিক এখানেই প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষিতের। যারা অপরের চিন্তা দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজের কলিজার জোড়ে। যারা সাদা-কালোয় জগতের সবকিছুকে অন্ধের মতো বিচার না করে বিচার করবে গোধূলির ধূসর আভায় সবটা পরখ করে। তবেই তো কোনো শাসক বহুকাল সেই সমাজকে বোকা বানিয়ে চলতে পারবে না, শোষকের মনে ভীতির সঞ্চার হবে— এই এই মানুষ ধরে ফেলবে রে, এখানে বাটপারি করা যাবে না; এভাবেই শিক্ষিত হয়ে উঠলে বাটপারদের সাম্রাজ্যের অবসান অবশ্যম্ভাবী।

সমাজে চারিদিকে তাকালে শিক্ষিত লোকের অভাব হয়তো পাবেন না কিন্তু অভাব পাবেন মূল্যবোধের। ধরুন কোনো শিক্ষক তার শিক্ষক সত্ত্বার কথা মাথা থেকে কার্যত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে যদি অসৎ পথ অবলম্বন করার নীতিকথা শোনান, কিম্বা শিক্ষার্থীদের পাঠ দিতে আসার আগেই মুখে তামাকজাত দ্রব্য পুরে আসেন, বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভেদাভেদের সঞ্চার ঘটান তাহলে সেই ব্যক্তিটিকে কি আদৌ শিক্ষিত বলতে পারা যায়? আবার ধরুন কোনো চিকিৎসক তার সরকারী হাসপাতালের রোগীকে তার বেসরকারী হাসপাতালের রোগী অপেক্ষা অধিক অবহেলা করলে প্রশ্ন তো আসবেই এই লোকটির কোন উৎকর্ষ টি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কেউই তার ধর্মের সঠিক পালন করতে পারছেন না।

এবারে যদি আসি আমাদের সমাজের পাইকারি অভিভাবক মানে রাজনৈতিক নেতা-সংগঠকদের কথায়। এনারা এমন এক খানা প্রজাতিতে পরিণত হয়েছেন যারা তাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকেই যেন বিপরীত করবেন বলেই উচ্চারণ করেন। সংবিধানের শপথ নেওয়ার পরেও ওনাদের এই প্রবৃত্তির এতটুকু পরিবর্তন হয় না। তবে এখন বলবেন এসব কি আগে কিছুই ছিল না; আগে কি নীতি ভঙ্গকারী ব্যক্তি জন্মান নি; তাহলে এখন কি সমস্যা? বলছি, এর আগেও নীতি ভঙ্গকারী ব্যক্তি ছিলেন তবে তাদেরও একটা নীতি ছিল অনেকটা এথিক্যাল হ্যাকার'দের মতো। হয়তোবা গোটা দেশে একটি মাত্রই 'আয়া রাম-গয়া রাম' ছিলেন কিন্তু আজ তো তাদেরই আধিপত্য। অধঃপতন ঘটেছে শালীনতার ভাষার। আর হারিয়েছে দায়বদ্ধতা। তাই তো চরম নিন্দনীয় ঘটনাকে যে কেউই 'স্বাভাবিক' ঘটনার ট্যাগ লাগাতে কেউই পিছপা হন না।

এখন আপনি আবার প্রশ্ন করবেন, আরে মশাই কি শুধু শিক্ষক চিকিৎসক রাজনীতিক এনাদের কথা শুনিয়ে কাকে 'শিক্ষিত করুন' বলতে চাইছেন? —ধৈর্য রাখুন সবটা বলছি। হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি; আপনি হতে পারেন কোনো শিশুর বাবা কিম্বা মা, হতেই পারেন ঠাকুমা-দিদা, ঠাকুরদা-দাদু, বড় দাদা-দিদি বা শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনার যেই হোন না কেন আপনার কাছের শিশুদের ছোট থেকে একটা বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন সেটা হলো

‘মূল্যবোধ’। সামাজিক দিক থেকে যাতে সে একজন ব্যক্তিকে যেন মানুষ হিসেবেই বিচার করে, সে তিনি যে পেশার মানুষই হোন না কেন। বয়সে বাবার সমান হওয়া সত্ত্বেও কোনো রিক্সাওয়ালা কিংবা সব্জি বিক্রেতাকে তাচ্ছিল্য ব্যঞ্জক ‘তুই’ বলে সম্বোধন না করে, এরকম মূল্যবোধ তার মধ্যে সঞ্চার করা আশু প্রয়োজন। যেহেতু বয়ঃসন্ধি কাল থেকে সকল শিশুরই সেক্স হরমোন ক্ষরণ আরম্ভ হয় ঠিক এমন সময় (আমি বিশেষ করে পুত্র শিশুদের ক্ষেত্রে বলবো) তাদের চিন্তা ভাবনাকে পরিচ্ছন্ন রাখাটাও একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়। শিশুদের শিক্ষিত করাটা একটি সার্বিক পদ্ধতি সেখানে একজন শিশুর মস্তিষ্ক যেন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটি সহবত সম্পন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি রেখে চলতে পারে তার দায়িত্বও আপনার। এই যেমন কাউকে ফিজিক্যালি অবজেক্টিফাই না করা, যদি কখনও করতে দেখেন তৎক্ষণাৎ তাকে সীমিত শাসন করুন কারণ মনে রাখবেন লেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়। শুধু এতটুকু করলেই দেখবেন সমাজে চলতে থাকা কিছু কুৎসিত সংস্কৃতি হয়তো হারিয়ে যাবে আর আমাদেরও মোমবাতি মিছিলে হাঁটতে হবে না।

শিক্ষা আমাদের এভাবেই এগিয়ে নিয়ে যায়। এখান থেকেই আমাদের অধিকার আদায় করা শিখি। আর আপনার শিশুটিকেও শিক্ষিত করে তুলুন তারপর দেখবেন হয় আপনার শিশুটি রাষ্ট্রের আইন সভায় যথাযোগ্য ভাষণ দিচ্ছে, নয়তো তার প্রতিনিধির যথোপযুক্ত সমালোচনা করছে তবে ভিখ চাইছে না। তাই আপনার কাছে অনুরোধ শিক্ষিত করুন দুবেলা খেয়ে হলেও করুন কারণ ‘এডুকেশন ম্যাটার্স’।।

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

ভাষা ও সমাজ

দেবব্রত শীল
স্নাতকরত (ষষ্ঠ অর্ধবর্ষ), ইংরেজি বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

'ভাষা' ও 'সমাজ' কেবল দুটি পুঁথিগত শব্দ নয়, মানবসভ্যতার অন্যন্য অংশ। 'ভাষা' [যা মূলত মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম] ও 'সমাজ' [যেখানে একাধিক চরিত্র কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে একত্রে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে] একে অপরের পরিপূরক। ভাষার মাধ্যমেই সমাজে সবরকম ভাবের আদান প্রদান সম্ভব হয় এবং সমাজের গতি বজায় থাকে, অপরদিকে প্রতিনিয়ত সামাজিক ভাবের আদান প্রদানের মাধমে ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভাষা ছাড়া মানব সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেমন অসম্ভব তেমনি সমাজ ছাড়া মানবজাতির অস্তিত্ব কল্পনা করাও সম্ভবপর নয়। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখা, ভাষা ও সমাজের এই আপাত সম্পর্ক মূল্যায়ন করে থাকে, তাকে আমরা Socio-linguistics বলে জানি।

Benedict Anderson তার 'Imagined Communities'(1983) বইয়ে বলেছেন—
"মানুষ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি কাল্পনিক গোষ্ঠী তৈরী করেন এবং গোষ্ঠীর বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ অভিমত তৈরী হয়"
উল্লেখ্য এই সাদৃশ্যের একটি অন্যতম প্রধান দিক হল ভাষা এবং এই গোষ্ঠীর বৃহত্তম রূপই সমাজ। সভ্যতার শুরুর থেকেই ভাষা সমাজের একক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে উঠে এসেছে । বলাই বাহুল্য যে, ঠিক এই ভাষার সমতার ভিত্তিতে আমাদের ভারতকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করেছে। ভাষার প্রভাব সমাজের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি বিষয় রাষ্ট্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুর ওপরই বর্তমান। সমাজে প্রভাবশালী ভাষা তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা দিয়ে সমাজের অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত ভাষাগুলিকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতকে মধ্যযুগে যেভাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় ও ঔপনিবেশিক শাসনের আমলেও ইংরেজি ভাষাকে তথাকথিত উচ্চ সমাজের ভাষা বা বাবু সমাজের ভাষা হিসেবে তুলে ধরা হয়। ভাষাই আদতে সেই শক্তি যার দ্বারা সমাজের কিছু মানুষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে কিছু অংশকে করে তোলে বঞ্চিত। সমাজের কিছু অংশ প্রভাবশালী ভাষাকে আয়ও করে এগিয়ে যায় সবসময়, আবার কিছু কিছু অংশ শুধু 'ভাষার ভিতি'তেই পিছিয়ে পরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আধুনিক ভারতীয় সমাজে ঔপনিবেশিক চিন্তার বশবর্তী হয়ে আজও, ভারতীয় ভাষার তুলনায় ইংরেজি ভাষাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার প্রবনতাই দেখা যায় ।

Gayatri Chakravorty Spivak তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak'(1985)-এ সমাজে মানুষের অবস্থান উল্লেখ করে বলেছেন— সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের ভাষার বা কথার আমাদের সমাজে কোনো মূল্য নেই। তিনি তার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কিভাবে নিম্নবর্গের মানুষেরা আদতে কথা বলতে অর্থাৎ কোনো প্রকার - 'discourse generate' করতে পারেন না। তাদের কথা কিভাবে উচ্চবর্গের

দ্বারা দমিত ও প্রভাবিত হয়ে, উচ্চবর্গের স্বরে পরিণত হয় তার একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন তিনি উক্ত প্রবন্ধে।

সমাজের অভ্যন্তরে ব্যক্তি জীবনেও 'ভাষা' তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা ব্যক্তি জীবনে সামাজিক আদান-প্রদান ভাষার যে ধারা বা ভাষার যে ভঙ্গির মাধ্যমে করি, তার দ্বারা সমাজে আমাদের 'ব্যক্তিপরিচয়' তৈরী হয়, যা শ্রেণি বিভক্ত সমাজে আমাদের প্রাপ্য সম্মানের মাপকাঠি নির্ধারণ করে। ব্যক্তির কথ্য ভাষার তথা ভঙ্গিমার দ্বারাই সমাজ যেকোনো ব্যক্তির সংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থানের আপেক্ষিক অনুমান করে থাকে। এই সামাজিক অভ্যাসের মাধ্যমে সমাজ ব্যক্তি জীবনের উপর সংঘর্ষ ও প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করে, যেখানে ব্যক্তি নিজের মাতৃ তথা কথ্য ভাষাকে ঘৃণা করতে শুরু করে ও সামাজের মধ্যে শ্রেণি বৈষম্য তৈরী হতে থাকে।

ভাষাগত আপেক্ষিকতা বা Sapin-Whorf hypothesis থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা বিশ্বে আমাদের উপলব্ধি এবং আমাদের চিন্তা শক্তিকে প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি কিভাবে সমাজকে উপলব্ধি করবে এবং বসবাস করবে তা বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন ধারণাকে 'encode' বা 'influence' করে গঠন করে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি—ব্যাকরণগত 'লিঙ্গ' (পুং, স্ত্রী, ক্লীব...) ভাষার একক গুলির ওপর ভিত্তি করে বস্তু বা ব্যাক্তিদের উপলব্ধি গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। ভাষাগত আপেক্ষিকতা সমাজের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা, সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং বিশ্ব দর্শনকে প্রভাবিত করতে পারে।

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

সর্বোপরি বলা যায়, ভাষাই সমাজের সেই মূল মাপদণ্ড যা সমাজের শিরদাঁড়া ধরে রাখে ও ক্ষমতার বণ্টনকে প্রভাবিত করে সমতার বাণীর অগ্রদূত হয়ে ওঠে। সমাজে সবার ভাষা রয়েছে, সমাজে সব কিছুর ভাষা রয়েছে— যেমন রয়েছে ক্ষমতার ভাষা, রয়েছে ধ্বংসের ভাষা আবার তেমনই রয়েছে শান্তির ভাষা। তফাৎ একটাই, কিছু ভাষা আমরা শুনতে চাই তথা কিছু ভাষা শুনতে পাই, আর কিছু ভাষা আমরা শুনতে পাই না। ভাষা আমাদের যেমন আন্দোলন শেখায় তেমন ভাষা আমাদের ভালোবাসাতেও শেখায়; যা সমাজকে বেঁধে রাখে। অবশেষে আমরা বঙ্গ সন্তান; যারা ভাষার জন্য গর্জে উঠতেও জানি, এবং ভালোবেসে রাখীও পরাতে জানি।

প্রসঙ্গ, পাঠান্তর এবং যুগযন্ত্রণার ‘রক্তকরবী’

ড. সুভাষ চন্দ্র দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়

“এমন দু:খ আছে যাকে ভোলার মতো দু:খ আর নেই”—‘রক্তকরবী’র বিশুর এই উক্তিতে যে যন্ত্রণা প্রকাশিত তা এক অর্থে মনুষ্যত্বের, কবির এবং প্রকারান্তরে সময়ের। দু:খ বা যন্ত্রণাই সৃষ্টির মূল। তাই এই দু:খ’ যেমন বিশুর গানের আকর, তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটকটিরও আধার। কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল সেই গভীরতর দুঃখের অন্দরবয়ন।

নাটকের নাট্যপরিচয়’ অংশের সূচনাতেই কবি জানিয়েছেন যে, এই নাটকটি ‘সত্যমূলক’। রক্তকরবী’কে রূপক বা সাংকেতিক বলা হলেও আমরা কবি-কথিত উক্তিকেই সমর্থন করব – “কবির জ্ঞান বিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।”

‘রক্তকরবী’র কাহিনী কাঠামোয় লক্ষ্য করা যায়, এতে একজন রাজা আছেন, নাম মকররাজ। যক্ষপুরের মাটির তলা থেকে তাল তাল সোনা সংগ্রহ করাই তার কাজ। সর্দার, মোড়ল আর খোদাইকর নিয়ে কেবলই তার যান্ত্রিক ধন সংগ্রহ। আর এই সংগ্রহের যান্ত্রিক আবহে মানুষের ব্যক্তি পরিচয়টিও গেছে হারিয়ে। সেখানে সবাই সংখ্যামাত্র কিংবা শ্রেণীমাত্র। কবির কথায়, “ব্যক্তিগত মানুষ আর মানুষগত শ্রেণীর পরিচয় নিয়েই নাটকের কালগত প্রেক্ষাভূমি। এখানে আছেন, বস্তুবাগীশ অধ্যাপক, ব্যথাতুর বিশু, আছে সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক কিশোর, সেই সঙ্গে ফাগুলাল, চন্দ্রা, অনুপ, উপমন্যু, শকলু ও কঙ্কুরা। আছেন গোঁসাইজী, সর্দারদের স্তাবক, পুরাণের ব্যাখ্যাতা পুরাণবাগীশ। আর সমস্তের আঘাত এবং পীড়নে যক্ষপুর যখন দিশেহারা তখন তাদের সংগ্রহের মধ্যে এসে জুটল ঈশানী পাড়ার নন্দিনী। তার প্রিয়জন রঞ্জনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসা হল তাকে। হঠাৎই যক্ষপুরে অনুভূত হল মানসিক মূল্যবোধের পীড়ন তীব্রতা। নন্দিনীর মানবিক প্রাণপ্রবর্তনার আঘাতে সমস্ত দুশ্চেষ্টার বন্ধন জাল গেল ছিড়ে।

শেষে রঞ্জন এল এবং তাকেও প্রাণ দিতে হল, রাজার হাতে ভুলের বশে। অবশেষে রাজাই যেন রঞ্জনের অভিজ্ঞান নিয়ে নিজের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেন শেষ মুক্তিতে। সঙ্গ নিলেন নন্দিনীর। বিদ্রোহে অংশ নিল যক্ষপুরে আটকে থাকা সমস্ত বন্দী আর খোদাইকর। পুঁথিপত্র ফেলে, একই মুক্তিতে অগ্রসর হলেন অধ্যাপক। নন্দিনীর জয় ঘোষণা করল বিশু আর ফাগুলাল। শুরু হল পৌষের গান। পরিণতি পেল নাট্যকাহিনী।

কবি জানিয়েছেন যে, আদিকবি বাল্মীকি ধ্যানযোগে তাঁর কালের কথাটি ধারণ করেছিলেন। এর সঙ্গে আমরা বলব, কবিগুরু কল্পনাবলে আমাদের সময়টিকেও নিবিষ্ট করেছিলেন তাঁর নাটকে। ফুলত: একালেরও সত্যের অভিজ্ঞান লাভ করেছে ‘রক্তকরবী’র অন্দরমহল। কবি মনে রাখতে বলেছেন,তার ‘রক্তকরবী’র সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। মানবী অর্থে মাটির কন্যা, তাই সে ধানী রঙের শাড়ী

পরে। পুরাণ প্রসঙ্গে, সীতাও ছিলেন মাটির কন্যা। এ নাটকের মূল দ্বন্দ্ব যেমন কর্ষণজীবী আর আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবির কিংবা সঞ্চয়ের সঙ্গে বন্টনের তেমনি রামায়নের রাম-রাবনের দ্বন্দ্বেও সেই সুরই বর্তমান। রামায়ণে সীতাকে নিয়ে যেমন দুই সভ্যতার সংঘাত, এ নাটকের নন্দিনী সম্পকেও একই কথা জুড়ে যায়। এ নাটকের মূল কথা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি সমগ্রতার বোধ। নন্দিনীও বলেছে যে, সমস্তকে টুকরো করে আনাই গ্রহণলাগা যক্ষপুরীর অভ্যাস। তাই একদিকে গ্রহণলাগা যক্ষপুরী আর অন্যদিকে রঞ্জন নন্দিনীর পূর্ণতার ছবি। অর্থাৎ নাটকটির অন্তরে রয়েছে সম্পূর্ণতার বোধ। পুরাণের যক্ষের মিথ অনুসারে যক্ষ এক চক্ষু, নাটকেও আছে "কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত" প্রসঙ্গত। আবার রামায়ণে রাবণের মৃত্যুরকারণ বিভীষণ। এখানে কবি তার মকররাজকে নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অর্থাৎ – একই দেহের অন্দরে কবি প্রতিস্থাপন করেছেন রাবণ ও বিভীষণের প্রতিভাস। আর এই সমস্যাতো একালেরও দ্রষ্টব্য। নিজের আগ্রাসী মনোভাব দ্বারা যেমন , ফুলে ফেঁপে ওঠা – তেমনি প্রকারান্তরে সেই আকাঙক্ষাই তার বিনাশের কারণ।

রবীন্দ্রনাথ এক সার্বিক সত্যকে সুন্দরের গ্রন্থিচিহ্ন দেওয়ার জন্য আজীবনই সাধনা করেছেন, তাকে ভালবেসে। বলেছেন — "সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম"। তাঁর ১৯১২-তে ইউরোপ গমন এবং ১৯১৩-তে বিশ্বকবির সম্মান লাভ। এই সময়ে তাঁর যতটা আনন্দলাভ, অন্তরে–বাইরে যন্ত্রণাও ততোধিক। ১৯১৪-তে 'বলাকা'র চতুর্থ সংখ্যক কবিতা 'শঙ্খ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম মহাযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা সংবাদ এসে পৌছালো। কবির সমস্ত মন জুড়ে যে ব্যথা চলছিল তা আরও প্রকট হয়ে উঠল। মহাযুদ্ধের যন্ত্রণা উঠে এল 'বলাকা'র কাব্য পংক্তিতে। নাটকের ক্ষেত্রে 'ডাকঘর' (১৯১২) ও 'অচলায়তন' (১৯১২)-এর পরও কবিকে তাই লিখতে হল 'মুক্তধারা' (১৯২৫) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬)।

মানবসভ্যতার নিবিড় সমস্যা আর নিরেট সংকটের অন্তর্ভূমি নিয়েই কবি শুরু করলেন, তাঁর 'রক্তকরবী'র নির্মানপর্ব। মানস গ্রন্থির সুক্তিগুলি মুক্তি পেল ধীরে ধীরে। কেননা তার যথার্থ রূপটি তুলে ধরতে কবিকে বার-দশেক অদল বদল করতে হল নাটকের। তাই 'রক্তকরবী'র সূচনা থেকে পূর্ণতা পর্যন্ত আমরা মোট ১০টি খসড়া বা পাঠান্তর পেলাম। এবং তাই শিলং পাহাড়ে ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মবকাশকালে যে নাটক লেখা শুরু করলেন তাকেই নন্দিনী-উত্তীর্ণ হয়ে 'রক্তকরবী'র পূর্ণর্তা পেতে সময় লাগল প্রায় এক বৎসর কাল। ১৩৩১ সালে (১৯২৪) আশ্বিন মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হল। এরপর গ্রন্থপ্রকাশ ১৩৩৩ সাল বা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস।

লক্ষ্যনীয়, 'রক্তকরবী'র ১০টি পাঠান্তরে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে নাটকের কথাবস্তু ও অনুসঙ্গ, চারিত্রিক পটভূমি আর গঠনকৌশল। অবশ্য কবির অভিপ্রায়ের বিশেষ কোন পরিবর্তন তাতে সূচিত হয়নি। আসলে দেশ কালের এক অব্যক্ত যন্ত্রণাকে পূর্ণতা দিতেই এই পরিবর্তন।

'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়াটি নিছক সংলাপনির্ভর। তাতে কোন চরিত্রের নাম সবিশেষ নির্দিষ্ট হয়নি। বলা যায়, সেটি হল নাটকের ভ্রূণ-স্বরূপ। তাতে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ কাঠামোটি থাকলেও পূর্ণ নাটকীয় রূপটি পাওয়া যায় না।

নাটকের প্রথম পাঠটি ফাগুলাল – চন্দ্রার কথা দিয়ে শুরু এবং শেষ কথাগুলি নন্দিনী ও রাজার। রাজার বাইরে বেরিয়ে আসাতেই নাটকের সমাপ্তি। আবার নন্দিনীর প্রথম নাম যে, "খঞ্জন" ছিল তাও এই খসড়া থেকেই জানা যায়। এই পর্বে নাট্যকার সরাসরি বিষয় বা আটকে পড়া মানুষদের কথা দিয়ে নাটক শুরু করেছেন।

এরপর দ্বিতীয় খসড়ায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট তথা উপযুক্ত আঙ্গিকে নাটকীয় রূপটি তুলে ধরেছেন। আবার এরই সূচনায় আছে একটি নাট্য পরিচয় অংশ; যার মধ্য দিয়ে কবি নাটকের বিষয়বস্তু ও ভাবগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে নাটকটি একটি অর্থযুক্ত রূপ পেয়েছে। এই খসড়াতে চরিত্র হিসেবে নির্দিষ্ট নামও পাওয়া গেল। এখানে নাট্য সংলাপ শুরু হয়েছে নন্দিনী ও রাজার কথা দিয়ে। উল্লেখ্য, এখানে 'রাজার মহলের জানালার বাইরে' নাট্যদৃশ্য রচিত হয়েছে অর্থাৎ তখনও জালের আবরণ আসেনি।

নন্দিনী প্রসঙ্গে বলা যায় তার নাম ছিল সুনন্দা – যা প্রকাশিত হয়নি। প্রথম পাঠে তার নাম পেয়েছি খঞ্জন। খঞ্জন সম্ভবতঃ রঞ্জনের সাদৃশ্যে। পরে খঞ্জন বাদ দিয়ে নন্দিন, নন্দিন কেটে নন্দা এবং শেষে হল নন্দিনী। লক্ষনীয়, প্রথম পাঠের শেষ হয়েছিল রাজা ও নন্দিনীর কথা দিয়ে আর দ্বিতীয় পাঠ শেষ হয়েছে ফাগুলাল, নন্দিনী এবং রাজার উক্তিতে। এবং এই দ্বিতীয় খসড়ার শেষেই একটি গান যুক্ত হচ্ছে 'ফসল কাটি, ফসল কাটি...' বলে।

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

নাটকের তৃতীয় পাঠে এসে প্রথম অধ্যাপক চরিত্রটিকে পাওয়া গেল। এবং নন্দিনী ও অধ্যাপকের কথা দিয়েই সূচিত হল এই পাঠের সূচনা। এই তৃতীয় স্তরটিতে কবির মনে যক্ষপুরীর ভাবনাও পেল প্রাধান্য। ফলতঃ এই পাঠটিকে আমরা যক্ষপুরী স্তর হিসাবেও চিহ্নিত করতে পারি।

শুরুর দিক থেকে এই তৃতীয় পাঠ ও পঞ্চম পাঠ অনুরূপ। শুধু তাই নয় , দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পাঠে নাটকের সূচনার পার্থক্য থাকলেও সমাপ্তির ক্ষেত্রে তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খসড়া দ্বিতীয় খসড়ারই মতো। বলাবাহুল্য যে, চতুর্থ খসড়াটি 'বহুরূপী'র অধীনে।

পঞ্চম পাঠে কবি তার নাটকের নাম দিয়েছেন 'নন্দিনী'। অর্থাৎ কবির দৃষ্টি এই স্তরে এসে নন্দিনীর উপর পড়েছে এবং সেই কারণে নন্দিনী চরিত্রটি যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি সমগ্র নাটকে তার প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর এই পঞ্চম পাঠ থেকে সপ্তম পাঠ পর্যন্ত শব্দগত ছাড়া অন্য কোন বিশেষ পরিবর্তন নেই বললেই চলে। কাজেই পঞ্চম থেকে সপ্তম পর্যন্ত পাঠকে নন্দিনী স্তর হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়।

ষষ্ঠ পাঠের সূচনাও অধ্যাপক ও নন্দিনীর উক্তি দিয়ে। তবে তৃতীয় বা পঞ্চম পাঠ থেকে এখানে কিছু পার্থক্য আছে। এখানে গোড়ার সমস্যাই পুনরায় ফিরে এসেছে এবং তা তুলে ধরেছেন অধ্যাপক। আবার এখানে অধ্যাপক ও নন্দিনীর সম্পর্কের আভরণটিও ঘুচে গেছে বলা যায়।

এই পাঠের সমাপ্তি পূর্ববর্তী পাঠেরই অনুরূপ। এতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই। সপ্তম পাঠের সূচনা অধ্যাপক ও নন্দিনীর মধ্যে দিয়ে হলেও তাদের সম্পর্কটির ভিন্ন মাত্রা সূচিত হয়েছে।

এই পর্বের সমাপ্তিতেও পরিবর্তন ঘটেছে। 'ফসল কাটি' বলে যে গানটি ছিল পূর্বপূর্ব পাঠে এখানে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে নন্দিনীর কণ্ঠের একটি গান দিয়ে নাটক সমাপ্ত হয়েছে – 'ও সন্ধ্যা তারায় শেষ চাওয়া তোর রইল...' ।

এরপর নাটকের অষ্টম খসড়াটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে কবি নাটকের নাম 'নন্দিনী' বদলে করেছেন 'রক্তকরবী'। সূচনা হয়েছে পূর্বের মতোই অধ্যাপক ও নন্দিনীর কথা দিয়ে। তবে অধ্যাপকের কথার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অধ্যাপক – 'বারে বারে তুমি অমন চমক লাগিয়ে যাও কেন ?' বলেছন, অর্থাৎ পূর্ব পাঠের – 'তুমি অমন চমক লাগিয়ে যাও কেন'–এর সঙ্গে 'বারে বারে' কথাটি নতুন যুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, নবম খসড়াটিও বহুলাংশে একই রকম। কিন্তু এতে অধ্যাপকের শুরুর কথায় পুনরায় পরিবর্তন ঘটেছে। 'বারে বারে' – থেকে এখানে হয়েছে 'ক্ষণে ক্ষণে তুমি অমন চমক লাগিয়ে যাও কেন ?'

কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

এই অষ্টম খসড়ার শেষে আছে ফাগুলাল ও বিশুর উক্তি। সেই সঙ্গে নন্দিনীর গান বাদ দিয়ে নতুন করে যুক্ত হয়েছে পৌষের গান – 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে... '।

এরপর নবম পাঠের সূচনায় সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও সমাপ্তি অষ্টম পাঠেরই মতো।

দশম খসড়ায় নতুন চরিত্র হিসেবে পাওয়া গেল কিশোরকে। নাটকের শুরু হ'ল নন্দিনী ও কিশোরের মধ্যে দিয়ে। বলা যায়, এই পর্বটিই 'রক্তকরবী'র পরিপূর্ণ রূপ।

এই পাঠের শেষে যে পরিবর্তন হয়েছে তা হল – পূর্বপাঠের বিশুর উক্তির 'তার রাখি বন্ধন' - বদলে করা হয়েছে 'তার শেষ দান'।

এই দশম পাঠের পর নাটকটি আরো কিছু শব্দগত এবং সামান্য আঙ্গিকগত পরিবর্তন সূচিত হয়ে – 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। আর সেই পত্রিকা-পাঠ এবং বর্তমান গ্রন্থপাঠ একই রকম। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এখানে আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরের কথা ভেবে কেবল নাটকের সূচনা এবং সমাপ্তি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া নাটকের সমগ্র

ক্ষেত্রে আরো পার্থক্য বর্তমান, যা স্বতন্ত্র আলোচিতব্য।

পরিশেষে একথাই বলা যে, 'রক্তকরবী'র অন্তরের সমস্যাটি কেবল রবীন্দ্রনাথের কালের নয় – তা সমস্ত কালের। কেননা, সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষের সমস্যার শেষ নেই। কবির মতে, 'মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের'। এক্ষেত্রে ভাবটা একই, কেবল ভঙ্গিটি বদলে যায় মাত্র। তাই 'রক্তকরবী'র কিশোর যে বিদ্রোহের কথা বলে নন্দিনীকে ফুল দিতে দিতে, সেই কিশোরকে আমরা একালেও খুঁজে পাই। পার্থক্য শুধু আজকের কিশোরদের রক্তকরবীর গাছটি খুঁজে পেতে অসুবিধে। তবে বিশ্বাসের মৃত্যু নেই। সেই সঙ্গে বিশু, যাকে কিনা নন্দিনীতে পেয়েছে, যার সমস্ত গানে দু:খহীণ ভালোবাসার আগুন ঝরে – সে-ও রক্তকরবীর কঙ্কনটি হাতে তুলে নেবে। আবার, যে রঞ্জন রক্তের রেখা এঁকে দিয়ে শুয়েছিল ধূলার পরমে – সেই রক্তবীজ থেকেই একালের রঞ্জন। এখন শুধু দরকার মৃত্যুহীণ প্রাণের মন্ত্র – প্রীতিক্ষা প্রথম কদম ফুলের।

নূতন কলমে
কিছু শিখবো, কিছু লিখবো

পরি সমাপ্ত